প্রকাশক—
ডক্টর পীযূষাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর—
মণীন্দ্রনাথ রায়
পরিবেষক প্রেস
২৩, ডিক্সন লেন
কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদপট—
জয়দেব ঘোষ
১০, জগন্নাথ দত্ত লেন
কলকাতা-৯

বাঁধাই—
ভারতী বাইণ্ডারি
৩, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
নববর্ষ ১৩৬০

প্রাপ্তিস্থান—
হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
২৭, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট
কলকাতা-৯
ও
বড় বড় বইএর দোকান

আড়াই টাকা

আমার পাঁচ বছরের ছোট্ট বন্ধু বাবলু যার কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি, তারই কচি হাতে 'সৌরভ' তুলে দিলাম।

কলকাতা
নববর্ষ ১৩৬০

বঙ্গভারতীর বেদীমূলে আমার এ ধূপ-
গুলি জ্বেলে দিলাম। আশা করি এদের
সৌরভে রসিকপ্রাণ আমোদিত হবে।
নিঃশেষে দগ্ধ হবার আগেই যদি
ধূপগুলি নিবে যায়, আক্ষেপ করব না,
কিছুটা সৌরভ বিতরিত হলেই
নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

কলকাতা
নববর্ষ ১৩৬০

পিন্টু

আতিথ্য

নগিন মাস্টার

হাসি

বাবলু

বোষ্টম-বোষ্টমী

রাত একটা

পিন্‌টু

১

একটি তিনতলা ছোট ফ্ল্যাট্ বাড়ি। প্রত্যেক তলায় এক একটি ফ্ল্যাট্। ফ্ল্যাট্‌গুলি স্বাবলম্বী। দোতলার ফ্ল্যাট্‌টা একমাস খালি পড়ে ছিল। সে প্রায় বছর সতের আঠার আগেকার কথা, তখন এখনকার মত বাড়ি এত দুষ্প্রাপ্য ছিল না, খালি বাড়ি পাওয়া যেত।

সে দিন সকালে দোতলার ঘরগুলো ধোয়া মোছা হচ্ছে দেখে, তেতলার, একতলার লোক বুঝতে পারলে দোতলায় লোক আসবে। সকলের চেয়ে কিন্তু কৌতূহলী হ'ল তেতলার পিন্‌টু। সাত বছরের ছেলে পিন্‌টু একটা বেল্‌টহীন হাফ-প্যান্‌ট্ প'রে, বাঁ হাত কোমরের কাছে চেপে ধ'রে ঘর ধোয়া মোছা দেখতে এল। চুপ ক'রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে দেখলে, তারপর এক দৌড়ে ওপরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে, দোতলা ধুচ্ছে, কেউ আসবে বুঝি বাবা?

সরলবাবুর মাস দুই হ'ল স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। পিন্‌টুই তাঁর একমাত্র ছেলে। আজকাল পিন্‌টু কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি ধৈর্যসহকারে শোনেন, সস্নেহে উত্তর দেন। পিন্‌টুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি উত্তর করলেন, তুমি বুঝি দেখতে গিয়েছিলে?

পিন্‌টুর আর সবুর সয় না, সে সরলবাবুর কথার উত্তর না দিয়ে ছটফট করতে করতে বললে, বল না বাবা, কারা আসবে, কখন আসবে?

আমাদের মত কেউ আসবে নিশ্চয়ই। তবে কখন আসবে কি ক'রে বলব বল।

তোমরা তো বড় হয়েছ, তোমরা তো সব জান ?

তুমি ঠিকই বলেছ পিন্টু, কিন্তু যারা আসবে তাদের তো আমি চিনি না, সেইজন্যে কারা আসবে, কখন আসবে বলতে পারছি না, বুঝেছ ?

পিন্টু অল্পক্ষণ চুপ ক'রে রইল তারপর বিজ্ঞের মত মুখখানা ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তো বললে আমাদের মত কেউ আসবে। আমার মত ছেলে আসবে, তোমার মত বাবা আসবে, মা-র মত মা আসবে ?

তারপর একটু ভেবে সে পুনরায় বলতে লাগল, তা মা-র মত মা কি ক'রে আসবে, কি বল বাবা, মা তো স্বর্গে গেছে, না বাবা ?

মা-র মত কেউ আসতে পারে, সব মা তো আর স্বর্গে যায় না।

সরলবাবু কথাটার মোড় ঘোরাবার জন্যে পিন্টুর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, তুমি তো পিন্টু আজ নতুন বই নিয়ে পড়তে বসলে না ?

পিন্টু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে, আমি তো পড়তে বসেছিলাম, নীচে যে খবরের কাগজওলা খবরের কাগজ নিয়ে যান ব'লে চেঁচালে, তাই তো ছুটে গিয়ে কাগজ আনতে গেলাম। নীচে নামতে নামতে দেখি কারা ঘর ধুচ্ছে, তাইতো তোমায় জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

তা বেশ করেছ, এখন যাও চিঠির বাক্স থেকে খবরের কাগজখানা নিয়ে এসে নতুন বই পড়তে বস। এ বইখানা শেষ হ'লেই আরো তো নতুন নতুন বই কিনতে হবে।

পিন্টু আর দ্বিরুক্তি না ক'রে দৌড়ে নীচে নেমে গেল। কাগজ হাতে ফিরে আসবার সময় সে দোতলার ফ্ল্যাটে পুনরায় ঢুকল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর এক দৌড়ে ওপরে উঠে গেল।

সরলবাবু পিন্টুকে বললেন, পিন্টু, তোমার কাগজ আনতে দেরি হ'ল কেন ?

ওরা এখনো ঘর ধুচ্ছে বাবা! বাবা ওরা আজকেই আসবে, না?
কৌতূহল নিবারণের জন্যে সরলবাবু উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

২

সরলবাবু দশটার সময় অফিসে বেরিয়ে গেলেন। পিন্টু, চাকর কে চাকর, বামুন কে বামুন, ওই এক ঢোল এক কাঁসি কৈলাসের হেপাজতে রইল। পিন্টু একটু দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলে। কৈলাসকে এমনিতেই সে হিমশিম খাইয়ে দেয়। তার ওপর একটা কৌতূহল এলে তো আর রক্ষে নেই। একেবারে যাকে বলে নাজেহাল বেসামাল।

আজ পিন্টু কৌতূহল প্রদীপ্ত। সর্বদাই মনের মধ্যে তার একটি মাত্র জিজ্ঞাসা, কখন ওরা আসবে? আজ তাকে সামলাতে কৈলাসকে বেগ পেতে হচ্ছিল। অনেক বুঝিয়ে পিন্টুকে সে প্রত্যহের মত দুপুরে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। পিন্টু ঘুমিয়ে পড়ল দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কৈলাসও ঘুমল।

পিন্টু কিন্তু ঘুময় নি। কৈলাসকে প্রতারিত করবার জন্যে সে চোখ বুঁজে পড়েছিল। আজ তার মনে কৌতূহল তোলপাড় করছে, এমনিতেই সে ঘুমতে চায় না, আজ আবার ঘুম!

কৈলাস ঘুমিয়ে পড়লে, পিন্টু ধীরে ধীরে দরজা খুলে নীচে নেমে গিয়ে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। ফটকটা সরু গলির ভেতর। গাড়ির শব্দ হ'লে বা মটরের হর্ন বাজলে পিন্টু রাস্তার ধারে ছুটে যায়, আবার ফটকের কাছে ফিরে আসে। এমনিভাবে অনেকক্ষণ তার কাটল। তারপর হঠাৎ সে বুঝতে পারলে, একখানা গাড়ি এসে রাস্তায় দাঁড়াল। পিন্টু ছুটে গিয়ে দেখলে সত্যি তাদের গলির মোড়ে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। সে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ফটকের এক কোণে চুপ ক'রে দাঁড়াল।

অপরেশবাবু স্ত্রী কন্যা নিয়ে গলিতে ঢুকলেন। তিনি দোতলার ফ্ল্যাটটা

ভাড়া নিয়েছেন। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফটক পার হ'য়ে দোতলার সিঁড়িতে উঠতে লাগলেন। আরতি পিছনে আসছিল। সে একটি ছোট ছেলেকে ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে আদরের সঙ্গে বললে, তুমি বুঝি খোকা এই বাড়িতে থাক ?

পিন্টু উত্তর করলে, আমি খোকা নই, আমি পিন্টু।

আরতি হেসে বললে, ও, তুমি পিন্টু, আমারি তো তা হ'লে খোকা বলা ভুল হয়েছে। তারপর পিন্টু, তুমি বুঝি এই বাড়িতে থাক ?

হ্যাঁ।

আরতি গায়ে হাত দিয়ে সস্নেহে বললে, আমরাও এই বাড়িতে থাকব, তুমি আমার কাছে আসবে ?

আপনারা বুঝি সকালে দোতলার ঘর ধুইয়েছেন ?

হ্যাঁ, আমরা থাকব কিনা, তাই ঘরগুলো পরিষ্কার করতে হবে তো। আচ্ছা পিন্টু, তুমি তোমার মা-র সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে ?

মা স্বর্গে গেছে।

আরতির হালকাভাব উবে গেল। তার হাসি মিলিয়ে গেল। মনে মনে সে ভাবলে, এইটুকু ছেলের মা মারা গেছে! করুণায় তার বুক ভ'রে গেল। পিন্টুকে কাছে টেনে এনে মুখখানায় হাসি মাখিয়ে সে বললে, তোমার বেল্‌ট্‌ কোথায় পিন্টু, তুমি যে প্যান্ট্‌ হাতে ধ'রে রয়েছ ?

পিন্টু উত্তর করলে, ওপরে আছে, আমি পরি না, কৈলাস বড্ড জোরে এঁটে দেয়।

তা হ'লে চল আমরা ওপরে যাই, তুমি বেল্‌ট্‌ নিয়ে এস, আমি তোমায় আলগা ক'রে খুব ভালভাবে পরিয়ে দেবো, কেমন ?

আরতি পিন্টুর হাত ধ'রে ওপরে উঠতে লাগল। দোতলায় উঠে আরতি জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা কোথায় থাক পিন্টু ?

তেতলার সিঁড়ি দেখিয়ে পিন্টু উত্তর করলে, ওই ওপরে।

এই সময় আরতির মা এসে চেঁচিয়ে বললেন, এ কাদের ছেলে রে ?

ওপরে থাকে, এর মা নেই, মা।

ও, তা তুই এখানে দাঁড়িয়ে আর কি করবি, সব গুছিয়ে নিবি চল, ঘরগুলো জিনিসপত্রে যে এক হাঁটু হ'য়ে রয়েছে।

যাচ্ছি মা।

নে, নে, বাপু আর ছেঁড়া ল্যাটা জড়াস নে। যেখানে যাবে সেখানেই একটা ল্যাংবোট।

তিনি চ'লে গেলেন। আরতি পিন্টুকে বললে, তুমি তা হ'লে বেল্টটা নিয়ে এস, আমি ততক্ষণ কাজ করিগে।

আরতি তেতলার সিঁড়ির দিকে পিন্টুকে একটু ঠেলে দিয়ে ভেতরে চ'লে গেল।
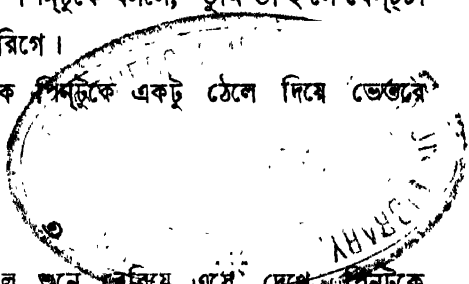
একঘণ্টা পরে আরতি গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসে দেখে, পিন্টুকে একজন লোক টানাটানি করছে আর বলছে, 'চল দাদাবাবু, ওপরে চল'।

পিন্টু কিন্তু বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

আরতি ব'লে উঠল, আহা, ওকে ছেড়ে দাও না, ওইরকম ক'রে টানাটানি করে !

লোকটি পিন্টুকে ছেড়ে দিয়ে উত্তর করলে, টানাটানি করব না তো কি করব মা ! অতি কষ্টে ঘুম পাড়িয়ে, চোখ বুঁজেছি, উঠে দেখি দাদাবাবু নেই। এঘর ওঘর খুঁজি, দাদাবাবু নেই ! আমার তো মা বুক উড়ে গেল ! বাবু যে রোজ অফিস যাবার সময় দাদাবাবুকে আমার হাতে দিয়ে বলেন, তোকে আমি চাকর বামুনের মত দেখি না কৈলাস, তুই এর রক্ষক, একে দেখিস বাবা, চোখে চোখে রাখিস !

আরতি জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বুঝি ওপরে আর কেউ থাকে না ?

না মা। ছ মাস হ'ল মা মারা গেছেন, তারপর থেকে আমরা তিন জনে থাকি।

পিন্টু প্রতিবাদ হিসাবে ব'লে উঠল, মা মারা গেল কোথায়! মা তো স্বর্গে গেছে।

আরতি কৈলাসের দিকে চেয়ে একটা ইসারা ক'রে বললে, সত্যিই তো কৈলাস, মা স্বর্গে গেছেন আর তুমি বলছ মা মারা গেছেন!

কৈলাস আরতির ইসারার মর্মার্থ গ্রহণ করতে না পেরে বিস্ময়ের সঙ্গে ব'লে উঠল, মারাই তো গেছেন, আমার চোখের সামনে মারা গেলেন।

পিন্টু ভয়ানক চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল, না কক্ষনো নয়, স্বর্গে গেছে। বাবা আমায় নিজে বলেছে, যাদের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেয়, তারা স্বর্গে যায়! মা-র মাথায় তো সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল।

আরতি পিন্টুর মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললে, সে আমি বুঝতে পেরেছি পিন্টু, মা স্বর্গে গেছেন। কৈলাস জানে না, তাই ও ওই কথা বলছে। বেল্ট এনেছ পিন্টু?

না। আমি ওপরে গেলে যে কৈলাস আমায় আবার ঘুম পাড়াত।

তুমি তা হ'লে এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিলে! আচ্ছা, এখন নিয়ে এস। কৈলাস আমার কাছে এখানে দাঁড়িয়ে রইল।

পিন্টু সন্তুষ্টচিত্তে ওপরে দৌড়ে গেল।

আরতি কৈলাসকে বললে, কৈলাস, মা মারা যাওয়া আর স্বর্গে যাওয়া একই কথা, বুঝেছ? তোমার দাদাবাবু মা ম'রে গেছে শুনতে চায় না, ও মনে করে, স্বর্গে গেছে মানে অন্য কোথায় হয়তো গেছে, আবার ফিরে আসবে।

কৈলাস চুপ ক'রে রইল। আরতি বললে, আচ্ছা কৈলাস, তোমার তো ভারি কষ্ট ওই ছেলে নিয়ে।

কি করি বলুন মা, বাবু বিপদে পড়েছেন, একবার যখন নুন খেয়েছি, এখন তো আর ছেড়ে পালাতে পারি না।

আরতি কৈলাসের মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর সে বললে, আমরা তো দোতলায় এলাম, তুমি যখন সাম্‌লাতে পারবে না, আমায় খবর দিয়ো, কেমন ?

পিন্‌টু বেল্‌ট্‌ হাতে ক'রে উপস্থিত। আরতি কৈলাসকে বললে, তোমার দাদাবাবু আমার কাছে রইল। তোমার ভাবনার কিছু নেই, তুমি কাজকর্ম করগে।

কৈলাস হৃষ্টচিত্তে ওপরে চ'লে গেল। আরতি সযত্নে পিন্‌টুকে বেল্‌ট্‌টা পরিয়ে দিয়ে বললে, পিন্‌টু, এখন তুমি ওপরে যাও, এখন আমি কাজকর্ম সেরে নি। তোমার বাবা এলে, বাবাকে ব'লে আবার এখানে আসবে।

পিন্‌টুর কিন্তু আরতির একথা পছন্দ হ'ল না। সে আরতির কথা অমান্য করতেও পারলে না, ধীরে ধীরে পিছন দিকে বার বার চাইতে চাইতে ওপরে উঠে গেল।

৪

আরতি কাজে মগ্ন হ'য়ে পিন্‌টুর কথা একরকম ভু'লেই গিয়েছিল। তিনখানা ঘরের জিনিসপত্র গোছানো কি সাধারণ ব্যাপার! পিন্‌টু কিন্তু একটু পরে সেই যে এসে দোতলার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, এক পাও নড়েনি। অন্য দিন হ'লে সে একবার ওপর, একবার নীচে, দৌড়ঝাঁপ, লাফালাফি ক'রে বেড়াত, কৈলাসকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলত। আজ সেই পিন্‌টু লক্ষ্মীছেলেটির মত নিঃশব্দে আরতিদের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাস কতবার ডেকেছে, ওপরে যায় নি। অগত্যা কৈলাস মাঝে মাঝে উঁকি মেরে পিন্‌টুর অবস্থিতি পরখ ক'রে নিচ্ছিল।

প্রায় দু ঘণ্টা পরে সরলবাবু সিঁড়িতে উঠতে উঠতে দেখেন, পিন্‌টু দোতলার দরজার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি পিন্‌টুকে বললেন, পিন্‌টু, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ?

ঠিক সেই সময় আরতি ফ্ল্যাটের ভেতরে বন্ধ দরজার সামনে জিনিষপত্র গুছচ্ছিল। পিন্টুর নাম শুনে তার চমক ভাঙল। তার মনে পড়ল পিন্টুকে সে আসতে বলেছিল। সে উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পিন্টু সরলবাবুকে দেখে সোৎসাহে বললে, বাবা এরা এসেছে?

কারা!

এই দোতলায়।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু জামাটামা কিছু পরো নি, খালি গায়ে এখানে দাঁড়িয়ে?

পিন্টু এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রবল উৎসাহে বললে, দেখ বাবা, আমায় কেমন বেল্‌ট্ পরিয়ে দিয়েছে।

কে পরিয়ে দিয়েছে বাবা?

পিন্টু দোতলার দরজার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে উত্তর করলে, এদের বাড়ির মা। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, আর আমায় বলেছে, তুমি এলে তোমাকে ব'লে এখানে আসতে।

স্নেহকাঙ্গাল পিন্টুর কথা শুনে সরলবাবুর একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ছোট হ'য়ে বুক থেকে উঠে বেরিয়ে গেল। তিনি মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, কিন্তু আমি আসবার আগে থেকেই তুমি তো এখানে এসে হাজির হয়েছ।

পিন্টু অপ্রস্তুতে পড়ল। সরলবাবু বললেন, এখন ওপরে চল, পরে এস। পিন্টুকে নিয়ে সরলবাবু ওপরে চ'লে গেলেন।

৫

আরতি আবার কাজে মন বসাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু মন তার আর বসল না। দরজাটা খুলে তেতলার সিঁড়ির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। পিন্টুর কিন্তু দেখা নেই। আরতিকে আরতির মা এই অবস্থায়

কিছুক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, সিঁড়ির দিকে হাঁ ক'রে কি দেখছিস ?

সেই ছেলেটিকে আসতে বলেছি, তাই অপেক্ষা করছি, দরজা বন্ধ দেখলে হয়তো ফিরে যাবে !

ও ঠিক আসবে, তুই হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে।

একটু পরে খাব মা।

আরতির মা আর কিছু বললেন না, ওঘরে চ'লে গেলেন।

আরতি এক ঘেয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঘরে খানিকক্ষণ বসে আবার পিন্‌টু এসেছে ভেবে দরজা খোলে। প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল, পিন্‌টু আর আসে না। কাপড় কেচে এসে ঘরে একখানা বই ওলটাচ্ছে, এমন সময় আরতির কানে পিন্‌টুর গলা এল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলে সে দেখে, পিন্‌টু কৈলাসের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। আরতি ডাকলে, পিন্‌টু।

পিন্‌টু আরতিকে দেখে দোতলায় উঠে এল। কৈলাস বললে, কি দাদাবাবু, কি হ'ল ! এই তো আমার হাড় মাস ছিঁড়ে খাচ্ছিলে, খাবার আনতে যাবে ব'লে। চল ?

আমি যাব না, তুমি যাও।

আরতি বললে, তুমি নিয়ে এস কৈলাস, ও আমার কাছে থাক।

কৈলাস চ'লে গেল। আরতি পিন্‌টুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। আরতি তাকে বসিয়ে বললে, কই পিন্‌টু, বাবা আসবার পর এলে না ?

পিন্‌টু চুপ ক'রে রইল। আরতি একটু আদর ক'রে বললে, আমার কথার জবাব দিলে না যে ?

হাবু এসে কেন বাবাকে মিথ্যে মিথ্যে ক'রে লাগালে আমি ওদের ফুল গাছের টব ভেঙ্গে দিয়েছি, তাই বাবা আমায় দাঁড় করিয়ে রাখলে, আসতে দিলে না।

হাবু কে পিন্টু ?

নীচেকার গিন্নী আছে না, তার ছেলে।

তুমি টব ভাঙনি অথচ হাবু এসে তোমার বাবাকে বললে, তুমি টব ভেঙে দিয়েছ !

আমি ওদের টব থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়েছি, টব ভাঙিনি।

ওদের ব'লে ফুল ছিঁড়েছিলে তো ?

না, আমি আর একদিন বলেছিলাম, ওরা তখন দেয়নি, তাই এমনি ছিঁড়ে নিয়েছি।

তোমার কিন্তু না ব'লে ছেঁড়া উচিত হয়নি, পিন্টু।

বা রে, ওরা যে দেয়না, আমার ফুল নিতে ইচ্ছে করে না বুঝি !

তা হ'ক, তবুও না ব'লে ছেঁড়া উচিত হয়নি।

পিন্টুর চোখ ছলছল ক'রে উঠল। সে একটু ধরা গলায় বললে, কিন্তু হাবু কেন মিথ্যে কথা বললে ?

এটা হাবুর বড় অন্যায় হয়েছে।

আমি কিন্তু এবার মিথ্যে কথা বললে, হাবুকে মারব।

মারামারি করতে নেই পিন্টু, এবার মিথ্যে কথা বললে তুমি বরং আমাকে ব'লে দিয়ো, আমি হাবুকে আচ্ছা ক'রে ব'কে দেবো।

পিন্টু একটু ভাবলে, তারপর বললে, ব'কে দিলে ও যদি তোমায় গালাগালি করে, আমি কিন্তু তখন ওকে মারবই।

আরতি হেসে বললে, ও আমাকে গালাগালিও করবে না, আর তোমায় মারতেও হবে না।

পিন্টু চুপ ক'রে রইল। আরতি বললে, পিন্টু আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, চল আমরা—

পিন্টু আরতিকে আর বলতে দিলে না। তড়াক ক'রে উঠে প'ড়ে বললে, আমি এক্ষুণি খাবারটা নিয়ে আসছি, তুমি একটুখানি সবুর কর।

আরতি পিন্টুকে হাত ধ'রে বসিয়ে বললে, ও-খাবার আনতে হবে না, ও তুমি খেয়ো, ওই দেখ আমার খাবার রয়েছে।

দুজনের খাওয়া শেষ হ'লে আরতি পিন্টুকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি আমায় কি ব'লে ডাকবে?

অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে পিন্টু চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়ল। সে আরতির মুখের দিকে চেয়ে রইল। আরতি পিন্টুর অবস্থা বুঝতে পেরে বললে, তুমি ঠিক করতে পারছ না, না? আচ্ছা, এক কাজ কর, আমায় মাসিমা ব'লে ডেকো, কেমন, পছন্দ হয়েছে?

পিন্টু মহা খুশী। সে বাবাকে এই সুসংবাদ দেবার জন্যে এক দৌড়ে তেতলায় চ'লে গেল।

৬

অপরেশবাবু আরতি পিন্টুর ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। পিন্টু চ'লে যাবার পর তিনি আরতিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটি কে রে অরু?

ওপর তলায় থাকে বাবা।

কি রকম টাটকা চেহারা দেখছ! এরই মধ্যে এতটা আলাপ কি ক'রে হ'ল রে?

আমরা যখন আসি, ও ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছিল, তুমি হয়তো লক্ষ্য কর নি। আমি একটু আদর ক'রে কথা বলতেই গ'লে গেল! ওর মা মাত্র দু মাস আগে মারা গেছে বাবা।

অ্যাঁ, বল কি!

হ্যাঁ। এখন ওর বাবা ওই ছেলেটি আর একজন লোক নিয়ে ওপরে থাকে।

সত্যি তো, ভয়ানক অসুবিধার কথা। দেখ অরু, আমি লক্ষ্য করেছি বাবা মারা গেলে ছেলে মানুষ হয়, কিন্তু মা মারা গেলে ছেলে মানুষ হওয়া শক্ত, অবশ্য তার যদি মা-র মত ক'রে দেখবার কেউ না থাকে।

এই সময় আরতির মা সেখানে এলেন। তিনি রাগতভাবে আরতিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, কি হচ্ছিস দিন দিন! এতবড় মেয়ে হ'লি, কুড়ি পেরিয়ে গেল, কখন কি করতে হয় শিখলি না! হাতে এত কাজ থাকতে গল্প করতে বসলি! এই তো এতক্ষণ ওই ছেলেটাকে নিয়ে কাটালি।

আরতি কাজ-পাগল মাকে চিনত। একটু হেসে সে বললে, আচ্ছা মা, তুমি এখানে চুপটি ক'রে ব'সে থাক, আমি দেখ একঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক ক'রে ফেলছি।

হ্যাঁ, সব বুঝে সুঝে কাজ কর বাপু, পরের ঘরে যেতে হবে তো।

আরতি হাসিমুখে উঠে গেল।

৭

এদিকে পিন্টু দৌড়ে গিয়ে সরলবাবুকে বললে, বাবা, দোতলার মা আমায় মাসিমা ব'লে ডাকতে বলেছে।

সরলবাবু পিন্টুর আনন্দোজ্জ্বল মুখের উপর চেয়ে রইলেন। পিন্টু সরলবাবুকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, বাবা, তুমি আমার কথা শুনতে পেয়েছ, দোতলার মা আমায় তাকে মাসিমা ব'লে ডাকতে বলেছে।

তুমি তাই ব'লে ডেকো। কিন্তু তুমি তো কৈলাসের সঙ্গে খাবার কিনতে গেলে, মাসিমার সঙ্গে দেখা হ'ল কি ক'রে?

আমি খাবার কিনতে যাচ্ছিলাম। মাসিমা ডাকলে, আর গেলাম না।

তারপর পিন্টু অতিশয় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, মাসিমা কাকে বলে বাবা?

মা-র বোনকে মাসিমা বলে।

পিন্টু সরলবাবুর উত্তর শুনে চিন্তিত হ'য়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ভাববার পর সে জিজ্ঞাসা করলে, মা-র বোন তো মাসিমা বাবা, কিন্তু মা তো স্বর্গে গেছে, মাসিমা যদি স্বর্গে যায়! তা হ'লে কি হবে বাবা!

পিন্টুর চোখ দুটি ছলছলে হ'য়ে উঠল। সরলবাবু হেসে বললেন, তুমি ভারি বোকা পিন্টু, মাসিমারা কি কখনো স্বর্গে যায়! ওখানে মায়েরাই যায়।

যদি যায় বাবা! আমি কিন্তু তোমাকে ব'লে রাখছি, আমি মাসিমাকে কিছুতেই স্বর্গে যেতে দেবো না।

তাই দিয়ো না।

কৈলাস খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াতেই পিন্টু উঠে গেল। সরলবাবু খবরের কাগজে মন দিলেন। পিন্টু কৈলাসকে বললে, আমার খাবারটা দাও।

কৈলাস খাবারটা পিন্টুর হাতে দিলে। পিন্টু ঠোঙাটা হাতে নিয়ে এক দৌড়ে নীচে নেমে গেল। কৈলাস হতভম্বের মত চেয়ে রইল।

পিন্টু নীচে গিয়ে দেখে দোতলার দরজা বন্ধ। দরজাটা একটু ঠেলে সে ভয়ে ভয়ে ডাকলে, মাসিমা?

ভেতর থেকে আরতির যেন মনে হ'ল কে যেন দরজাটা ঠেলছে। সে দরজা খুলেই দেখে পিন্টু পিছনদিকে হাত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

আরতি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে, পিন্টু ভিতরে আসবে?

পিন্টু ধাঁ ক'রে আরতির হাতে ঠোঙাটা গুঁজে দিয়ে তেতলার সিঁড়িতে দৌড়ে উঠতে উঠতে বললে, আমার খিদে নেই মাসিমা, তুমি এ খাবারটা খেয়ো।

আরতি পিন্টুর দিকে চেয়ে বিস্ময়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরল না।

৮

পিন্টু সচরাচর সাড়ে ছটা সাতটায় ঘুম থেকে ওঠে। পরদিন পিন্টুর ঘুম ভোর পাঁচটায় ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গেই সর্বপ্রথম তার মাসিমাকে মনে পড়ল। সে একটা প্রচণ্ড পুলক অনুভব করলে। গত দিনের সমস্ত ঘটনা

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। যতই সে ভাবতে লাগল, ততই তার আরো ভাবতে ভাল লাগল। তখন বেশ অন্ধকার। পিন্টু খানিকক্ষণ পরে উত্তেজনায় উঠে ব'সে সরলবাবুর দিকে একবার চাইলে, তারপর পা টিপে টিপে দোতলায় যাবার সিঁড়ির দরজা খুলে দোতলায় নেমে গিয়ে আরতিদের দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ডাকলে, মাসিমা ?

কারো কোন সাড়া নেই। এবার সে একটু জোরে ডাকলে, মাসিমা ? তবুও কোন সাড়া পেলে না। ক্ষুন্ন মনে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সকাল তখন সাড়ে সাতটা। সরলবাবুর ডাকে পিন্টুর ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। সরলবাবু বললেন, পিন্টু, তুমি যে এতক্ষণ ঘুমচ্ছিলে ! শরীর খারাপ হয় নি তো ! দেখি তোমার গা ?

গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা ক'রে বললেন, শরীর ভাল আছে। নাও, চটপট ক'রে মুখ ধুয়ে এস।

পিন্টু মুখ ধুয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই খবরের কাগজওলা হাঁক দিলে। পিনটু ছুটে কাগজ আনতে গেল। দোতলার ফ্ল্যাটের দরজা খোলা, সে একবার উঁকি মেরে আরতিকে দেখতে না পেয়ে নীচে নেমে গেল।

অন্যদিন খবরের কাগজখানা সরলবাবুর চিঠির বাক্সের ওপর থাকে, আজ পিন্টু গিয়ে সেখানে সেখানা দেখতে পেলে না। এধার ওধার খুঁজে কাগজখানা দেখতে না পেয়ে সে কাগজওলাকে ধরবার জন্যে গলির মোড়ে দৌড়ে গেল। কাগজওলাকে সামনের বাড়ি থেকে কাগজ দিয়ে বেরতে দেখে পিন্টু জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের কাগজ দিলে না ?

চিঠির বাক্সের ওপর তো রেখে এসেছি।

সেখানে নেই তো !

আছে ভাল ক'রে দেখ গে।

পিন্টু ফিরে এসে আবার খুঁজলে, কিন্তু কাগজ পেলে না। নীচেকার হাবু

পিন্টুর চেয়ে বছর তিনেকের বড় হবে। পিন্টু তাদের কাল ফুল ছিঁড়েছিল ব'লে তার রাগ যায় নি। গিন্নীর আদেশে পিন্টুর বাবাকে নালিশ জানিয়েও তার ক্ষোভ মেটেনি। তাই সে আজ পিন্টুদের কাগজখানা সরিয়ে রেখেছিল। পিন্টু যখন খোঁজাখুজি করছিল, তার আনন্দ হচ্ছিল। সে তাদের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিল। হাবুর দিকে পিন্টুর চোখ পড়তেই হাবু ব'লে উঠল, কেমন হয়েছে, আমাদের ফুল ছেঁড়ো।

পিন্টু আরতির নিষেধের কথা স্মরণ ক'রে হাবুর কথায় কর্ণপাত করলে না। অন্যদিন হ'লে সে এতক্ষণ মারামারি লাগিয়ে দিত। পিন্টু ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল। তিন চারটে সিঁড়ি উঠেছে এমন সময় হাবু ব'লে উঠল, এই দেখ্, তোদের কাগজ, তুই যেমন আমাদের ফুল ছিঁড়েছিলি, আমিও তোদের কাগজ ছিঁড়ছি।

পিন্টু ঘুরে দাঁড়িয়ে হাবুকে খবরের কাগজ ছিঁড়তে দেখে একেবারে দৌড়ে হাবুর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে প'ড়ে অনবরত কিল, ঘুষি চালাতে লাগল। হাবু এই তড়িৎ আক্রমণে প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। তারপর সে চিৎকার করতে আরম্ভ করলে।

হাবুর চিৎকারে গিন্নী ও হাবুর বাবা ছুটে এলেন। গিন্নীর বিকট চিৎকারে অপরেশবাবু এবং সঙ্গে সঙ্গে আরতিও নেমে এল। গিন্নী চিৎকারে বাড়ি ফাটিয়ে বলছেন, মা-খেকো ছেলেটা আমার ননির পুতুলকে মেরে ফেললে। স্বামীর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, ওগো ধর না, ছেলেটাকে যে একেবারে পিষে ফেললে।

হাবুর বাবা জোর ক'রে পিন্টুকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পিন্টু আজ যেন মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। ছোট ছেলে হ'লে কি হয়, তার মা মারা যাবার পর থেকে হাবুর মা ও হাবুর কটু ব্যবহার, গতকাল হাবুর মিথ্যা ক'রে লাগানো এবং আজ হাবুর টিটকারি তাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে।

এরূপ অবস্থা দেখে আরতি গলায় জোর দিয়ে বললে, পিন্টু, ওকে ছেড়ে দাও।

আরতির গলা কানে আসতেই পিন্টু হাবুকে ছেড়ে দিলে। হাবুর চোয়াল থেকে রক্ত পড়তে দেখে গিন্নী জ্ঞানহারা হ'য়ে গেলেন। তিনি ছুটে গিয়ে পিন্টুকে ধ'রে বেদম প্রহার শুরু করলেন। আরতি আর স্থির থাকতে পারলে না, সে ছুটে গিয়ে পিন্টুকে জড়িয়ে ধরলে। অজস্র মার তার ওপর পড়তে লাগল।

হাবুর বাবা স্ত্রীর এই জ্ঞানহারা আচরণে, লজ্জায় অস্থিরতা বোধ করতে লাগলেন। তিনি সজোরে গিন্নীর একখানা হাত ধ'রে ফ্ল্যাটের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেন। হাবুও ওদের পিছনে পিছনে ঢুকে পড়ল।

গোলমালের আওয়াজ সরলবাবুর কানে গিয়েছিল। তিনি প্রথমটা কি না কি ভেবে ততটা কান দেন নি। তারপর যখন বিকট চিৎকার আরম্ভ হ'ল, তিনি কোন বিপদের আশঙ্কা ক'রে নীচে নামতে লাগলেন। একতলায় সিঁড়ির বাঁকে এসে দেখেন, একজন পিন্টুকে জড়িয়ে ধ'রে রয়েছে আর হাবুর মা পিন্টুকে মারবার চেষ্টা করতে গিয়ে তরুণীটির উপর অজস্র হাত চালাচ্ছেন। সরলবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হাবুরা সকলে ভেতরে যাওয়ার পরও আরতি নিশ্চল হ'য়ে পিন্টুকে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। দেখলে মনে হয়, সে যেন ঘোরে আছে।

অপরেশবাবু ওই সব কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব ব'নে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, ওকে নিয়ে ওপরে চ'লে এস।

অপরেশবাবুর কথায় আরতির ঝোঁক কাটল। সে পিন্টুকে ছেড়ে দিয়ে পিন্টুর সামনাসামনি দাঁড়াতেই পিন্টু কেঁদে ব'লে উঠল, তোমার হাত দিয়ে যে রক্ত বেরচ্ছে মাসিমা!

আরতি রক্ত লক্ষ্য করে নি। সে এখন দেখলে, তার বাঁ হাতের কনুইএর কাছে অনেকখানি কেটে গিয়ে রক্ত বেরচ্ছে। খুব সম্ভব হাবুর মার চুড়ি

লেগে কেটে গেছে। আরতি বললে, রক্ত তো পড়বেই। তোমায় কত ক'রে বললাম, তুমি হাবুর সঙ্গে মারামারি ক'রো না, যা হবে আমায় ব'লে দেবে, তুমি তো শুনলে না!

পিন্টু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, ও কেন আমাদের খবরের কাগজ লুকিয়ে রেখেছিল, ও কেন আমায় বললে, 'তুই আমাদের ফুল ছিঁড়েছিলি, এই দেখ্ আমি তোদের কাগজ ছিঁড়ছি!' এই দেখ না, কাগজখানা কি রকম ছিঁড়েছে!

পিন্টু ছেঁড়া কাগজখানা দেখালে। আরতি বললে, ও কাগজ ছিঁড়ছিল ছিঁড়ছিল, আমায় তুমি জানালে না কেন?

তা ব'লে তোমার রক্ত পড়বে!

হ্যাঁ পড়বে, বেশি ক'রে পড়বে।

আর আমি কক্ষনো মারামারি করব না মাসিমা, তা হ'লে তো তোমার রক্ত পড়বে না?

না।

আরতি পিন্টুর হাত ধ'রে একটু এগিয়ে আসতেই সরলবাবু অলক্ষ্যে ওপরে উঠে গেলেন।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে অপরেশবাবু বললেন, তুমি মা ওপরে গিয়ে হাতটা ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে আইওডিন লাগিয়ে দাও, বিষিয়ে না যায়।

ওপরে গিয়ে হাতটা পরিষ্কার ক'রে আইওডিন লাগাতেই আরতির মুখখানা জ্বালায় বিকৃত হ'য়ে উঠল। তাই দেখে পিন্টুর কী দুর্ভাবনা! সে তাড়াতাড়ি বললে, তোমার কি বড্ড কষ্ট হচ্ছে মাসিমা? আমি ফুঁ দিয়ে দেবো?

এই ব'লে সে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই খুব জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগল। অল্প কিছুক্ষণ দিতে না দিতেই সে ব'লে উঠল, তোমার কষ্ট কমছে মাসিমা?

তখনো জ্বালা করা সত্ত্বেও আরতি উত্তর দিলে, হ্যাঁ কমছে।

কিন্তু তুমি যে এখনো উঃ আঃ করছ!

একটুখানি আছে।

পিন্টু কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বললে, একেবারে ক'মে যাচ্ছে না কেন!

কৈলাস এসে সংবাদ দিলে, সরলবাবু পিন্টুকে ডাকছেন। আরতি বললে, পিন্টু, তোমার বাবা ডাকছেন, তুমি এক্ষুণি ওপরে যাও।

তোমার যে এখনো কষ্ট কমেনি, মাসিমা!

পিনটুর যেতে মন সরছিল না। কিন্তু আরতির কথার অবাধ্য হ'তে আর তার সাহস হচ্ছিল না। তার ভয় হচ্ছিল, আবার যদি রক্ত পড়ার চেয়ে আরতির বড় কিছু ঘটে। সে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওপরে চ'লে গেল।

৯

আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে পিন্টু দোতলার ফ্ল্যাটে এসে হাজির। যেখানে আরতি উঃ আঃ করছিল, সেখানে আরতিকে দেখতে না পেয়ে সে ভয় পেয়ে গেল। সে ফ্যালফ্যাল ক'রে এদিক ওদিক চাইতে লাগল।

অপরেশবাবু বারান্দায় ব'সে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। পিন্টুকে দেখতে পেয়ে বললেন, কি হে টাটকা ছেলে, কি মনে ক'রে?

আরতির মা পিন্টুর দিকে কঠিন হ'য়ে চাইলেন। পিন্টু অন্য সময় হ'লে এই অবস্থায় পশ্চাৎ অপসরণ করত, কিন্তু আজ যে তার আরতির সংবাদ চাই। তাই সাহস সঞ্চয় ক'রে মলিন মুখে সে জিজ্ঞাসা করলে, মাসিমা কোথায়?

আরতির মা ব'লে উঠলেন, এই হতভাগাটার জন্যেই তো মেয়েটার গতর আজ চূর্ণ হ'ল, আবার কি কাণ্ড বাঁধায় দেখ!

অপরেশবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, ছোট ছেলে, ও কি সব বোঝে!

তবে আর কি, বাপ বেটিতে ওকে মাথায় ক'রে নিয়ে নাচ! ওই তো রূপের

ধুচুনি, হাতটা যে ফালা হ'য়ে কাটল, ওর দাগ কি ক'রে মিলাবে শুনি ?
ও সব ঠিক হ'য়ে যাবে।
পিন্টুকে অপরেশবাবু বললেন, কোণের ঘরে মাসিমা আছে, যাও।
পিন্টু কোণের ঘরে সভয়ে ঢুকে দেখে, আরতি কেটে যাওয়া হাতটা একটা বালিশের ওপরে রেখে, অন্য হাতটা চোখের ওপর চাপা দিয়ে স্থির হ'য়ে শুয়ে আছে। পিন্টু ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। সে কাঁদ কাঁদ হ'য়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। এই সময়ে আরতি একটু নড়তেই পিন্টু সাহস পেলে। সে ধীরে ধীরে আরতির কাছে গিয়ে আরতির কাটা জায়গাটায় তখনো রক্ত পড়ছে দেখে ফুঁ দিতে লাগল।
আরতি চমকে উঠে বললে, কে রে ?
তারপর চোখ চেয়ে পিন্টুকে সামনে দেখতে পেয়ে বললে, পিন্টু ! আর ফুঁ দিতে হবে না, জ্বালা ক'মে গেছে।
না এখনো কমেনি, তোমার তা হ'লে এখনো রক্ত বেরচ্ছে কেন ? তুমি কেন তবে শুয়ে আছ ?
আরতির জ্বালা সত্যই আর নেই, কিন্তু তার সমস্ত শরীর কিল চড়ে বিষিয়ে উঠেছে। নীচেকার গিন্নীর উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে হাড়-বেরনো হাতের অবিরাম মারের ধমক তখন ঝোঁকের মাথায় সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু এখন ক্রমশ হাড়ে হাড়ে সে টের পাচ্ছে। সেইজন্যে সে চুপ ক'রে শুয়েছিল। পিন্টুর কথায় আরতি হেসে বললে, না রে না, আমি ভাল আছি।
তবে ও রক্ত বেরনো কিছু নয় মাসিমা ? এক্ষুণি রক্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে, না মাসিমা ?
হ্যাঁ। তোমায় যে তোমার বাবা ডাকলেন, আর তুমি ওপরে গিয়েই নীচে চ'লে এলে ! তোমার বুঝি আমার জন্যে খুব ভাবনা হয়েছিল ?
হ্যাঁ।
তুমি বাবাকে ব'লে এসেছ ?

না।

এখন তো আমি ভাল আছি, তুমি ওপরে যাও! বাবাকে ব'লে আসতে হয়, বুঝলে?

তোমার রক্ত বেরনো বন্ধ হ'লে তবে আমি যাব।

না পিন্টু, তুমি বাবার কাছে যাও, তিনি হয়তো তোমায় দেখতে না পেয়ে অনর্থক খোঁজাখুঁজি করছেন।

১০

পিন্টু ওপরে গেল। সরলবাবু সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। পিন্টুকে দেখেই চ'টে গেলেন। একটু চেঁচিয়ে বললেন, তুমি না ব'লে কোথায় গিয়েছিলে? পিন্টু সরলবাবুর এরকম মূর্তি দেখি নি বললেই হয়। একেই তার আরতির তখনো রক্ত বন্ধ হয় নি ব'লে মনটা খুব খারাপ ছিল, তার ওপর সরলবাবুর এই অনভ্যস্ত মূর্তি দেখে, সে আরতিকে যে দেখতে গিয়েছিল বলতে পারলে না। সরলবাবুর দিকে কেবল ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

পিন্টুর এই নিরুত্তরভাব সরলবাবুকে আরো চটিয়ে দিলে। তিনি বললেন, উত্তর দিচ্ছ না যে! আমি তোমায় নীচে খুঁজে এসেছি, দোতলায় উঁকি মেরে দেখেছি, কোথাও তোমায় পাই নি। তোমার দেখছি রাস্তায় টোটো করা স্বভাব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কোথায় ছিলে উত্তর দাও?

পিন্টুর যেন বাগ্‌রোধ হ'য়ে গেল! সরলবাবু বলতে লাগলেন, আজকাল তুমি পেজমো শিখেছ, আচ্ছা. আমি ব্যবস্থা করছি।

তিনি চিৎকার ক'রে কৈলাসকে ডাকলেন। কৈলাস তখন রান্না করছিল। মনিবের ডাকে আসতেই সরলবাবু বললেন, তুমি একে ওপর থেকে এক পাও নীচে নামতে দেবে না, এই আমার হুকুম। যদি না শোনে ঘরে চাবি দিয়ে রাখবে, বুঝলে?

সরলবাবু চেঁচামেচি করলেন বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মনটা ভারি হ'য়ে উঠল। পিন্টুকে ডেকে গোটাকতক মিষ্টি কথা বলতে তাঁর ইচ্ছা হ'ল। পাছে ছেলের অন্যায় এতে প্রশ্রয় পায়, এই ভেবে পিন্টুকে আর তিনি ডাকলেন না। ভারি মন নিয়েই অফিসে চ'লে গেলেন।

পিন্টু সেই যে বকুনি খেয়ে ঘরের কোণে ব'সে রইল, সরলবাবু চ'লে যাবার পরও উঠল না। কৈলাস পিন্টুকে নাওয়াবার খাওয়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পিন্টু বেঁকে ব'সে রইল। সে মুশকিলে পড়ল। আরো এক ঘণ্টা কেটে গেল। পিন্টু কিন্তু অনমনীয়।

কৈলাসের হঠাৎ আরতির কথা মনে পড়ল। সে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে দোতলায় গেল। আরতির মাকে দেখতে পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, মা কোথায়?

আরতির মা কৈলাসকে চেনেন না। তিনি সবিস্ময়ে বললেন, কে মা?

এই বাড়ির মা, যিনি দাদাবাবুকে আদর করেন।

দাদাবাবুকে! তোমরা কোথায় থাক?

ওপরে।

আরতির মা বুঝতে পেরে বললেন, মা-র অসুখ করেছে, মা শুয়ে আছে, এখন দেখা হবে না।

আরতি শুয়েছিল। কৈলাসের গলা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে এসে সে বললে, কি কৈলাস, আমায় কিছু বলবে?

আরতির মা বললেন, তোর শরীর খারাপ, তুই কেন উঠে এলি! না, তোরা আমায় পাগল করবি!

আমার শরীর এখন ভাল মা।

তারপর কৈলাসের দিকে চেয়ে সে বললে, আমায় কিছু বলবে?

দাদাবাবু নাইছেও না, খাচ্ছেও না। বাবু আজ বোধ হয় বকেছেন। আমায় অফিস যাবার সময় ব'লে গেলেন, দাদাবাবুকে এক পাও নীচে নামতে

না দিতে। তাই বোধ হয় দাদাবাবুর রাগ হয়েছে। তুমি একবার যাবে মা?

চল।

আরতির মা বললেন, গুণধর ছেলেটার আবার রাগও আছে! যাও, নাই দাও গে, আর একটা কাণ্ড বাঁধাক।

আমি এক্ষুণি আসছি মা।

আরতি কৈলাসের সঙ্গে ওপরে উঠে গেল। ঘরে ঢুকতেই আরতিকে দেখে পিন্টুর এক মুহূর্তে গোঁজভাব কেটে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বললে, রক্ত বন্ধ হয়েছে মাসিমা?

হ্যাঁ। এই দেখ আমার রক্ত বন্ধ হয়েছে। তুমি এখনো চান কর নি পিন্টু! নাও নাও, চান করে নাও, বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে! কৈলাস তেল কোথায় দাও তো?

পিন্টুর মুখখানা আনন্দোজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। কৈলাস তেল এনে দিলে। আরতি তেল মাখাতে গেলে পিন্টু বিজ্ঞের মত ব'লে উঠল, তুমি কোন কাজ ক'রো না মাসিমা, তোমার হাত দিয়ে তা হ'লে আবার রক্ত বেরবে।

আরতি হাসলে। পিন্টু চটপট ক'রে তেল মেখে স্নান করতে চ'লে গেল।

সরলবাবু অফিসে গিয়ে টেঁকতে পারছিলেন না। পিন্টুর প্রতি রূঢ় ব্যবহারের কথা কেবলই তাঁর মনে পড়তে লাগল। পিন্টুর সেই অসহায় সকরুণ দৃষ্টি তাঁকে ভীষণ পীড়া দিতে লাগল। তিনি দু ঘণ্টার ছুটি নিয়ে পিন্টুকে মিষ্টি কথা শোনাবার জন্যে বাড়ি ফিরে এলেন।

ওপরে উঠে দেখেন, ঘরের মধ্যে পিন্টু সোৎসাহে খেয়ে যাচ্ছে আর আরতি হাসিমুখে ব'সে আছে।

আরতি পিন্টুকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বুঝি বড্ড রাগ হয়েছিল পিন্টু, তাই তুমি এতক্ষণ নাওয়া খাওয়া কর নি?

হ্যাঁ। আমি তো তোমার অসুখ করেছিল ব'লে তোমায় দেখতে গিয়েছিলাম

মাসিমা, বাবা আমায় বললে, 'তুই টোটো ক'রে রাস্তায় ঘুরিস।'

তা, তুমি যে আমায় দেখতে গিয়েছিলে বাবাকে বলেছিলে ?

কি ক'রে বলব, বাবা যে ভয়ানক রেগে গেল। আমার ভয় করতে লাগল।

তুমি না বললে, বাবা কি ক'রে বুঝবে, তুমি রাস্তায় টোটো করতে যাও নি, আমায় দেখতে গিয়েছিলে !

বাবা তো সব বোঝে, বাবা তো বড় হয়েছে।

তা হ'লে অবশ্য বাবার বোঝা উচিত ছিল।

আরতি হাসতে লাগল। পিন্টুও হাসতে লাগল। পিন্টুর হঠাৎ দরজার দিকে নজর পড়তে, সে সরলবাবুকে দেখতে পেয়ে, সকালের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, উৎফুল্ল হ'য়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, বাবা, মাসিমার রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে !

সরলবাবু এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে তো, তা হ'লে তো তোমার আর কোন ভাবনা নেই, তুমি ভাল ক'রে খাও।

সরলবাবু আরতিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, আপনি কেমন আছেন ? হাতটা অনেকখানি কেটে গিয়েছিল !

আরতি পিন্টুর দিকে চেয়েই উত্তর করলে, ভাল আছি। ও তেমন কিছু হয় নি।

আমাদের জন্যে আপনাকে কত কষ্টভোগ করতে হ'ল !

আরতি নিরুত্তর রইল। অল্প কিছুক্ষণ পরে পিন্টুকে উদ্দেশ ক'রে আরতি বললে, পিন্টু আমি এবার যাই, তুমি খাও, কেমন ? বিকেল বেলায় আমাদের ওখানে যেয়ো। পিন্টুর মহা ফুর্তি। সে ব'লে উঠল, আমি কিন্তু নতুন বইখানা নিয়ে যাব, তোমাকে আমায় পড়াতে হবে।

আরতি হেসে 'আচ্ছা' ব'লে উঠে পড়ল। সরলবাবু হাত যোড় ক'রে নমস্কার জানালেন, আরতি প্রতি নমস্কার ক'রে নীচে নেমে গেল।

১১

অল্প কিছুদিনের মধ্যে পিন্টুর মারফত তুই পরিবারের মধ্যে গাঢ় সদ্ভাব জন্মাল। পিন্টু এখন আরতির কাছে পড়াশুনা করে। ওপরে গিয়েও এক মনে লেখার ওপর সে মক্শ করে। এখন আর কোন ঝঞ্ঝাট নেই। এমন কি হাবুর সঙ্গেও কোন গণ্ডগোল করে না। হাবু শত ব্যাঙ খোঁচা করলেও, সে হেসে উড়িয়ে দেয়।

সেদিন রবিবার। আরতিকে দেখতে এসেচে। পিন্টু সেখানে উপস্থিত। দেখে যাবার পর পিন্টু আরতিকে জিজ্ঞাসা করলে, ওরা কি করতে এসেছিল মাসিমা ?

আমাকে দেখতে এসেছিল।

কেন দেখতে এসেছিল ?

আরতি হেসে বললে, আমি কানা খোঁড়া কি না তাই বোধ হয় দেখতে এসেছিল।

দেখে কি হবে মাসিমা ?

আমার বিয়ে হবে কিনা।

বিয়ে ব্যাপারটা যে কি পিন্টুর সঠিক ধারণা ছিল না। কারণ সে কখনো বিয়ে দেখে নি। আরতির শেষের কথাগুলো কিন্তু তার মনঃপূত হ'ল না। সে একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে জিজ্ঞাসা করলে, কেন বিয়ে হবে মাসিমা ?

সকলের হয়, তাই আমার হবে। দেখো না, কত সন্দেশ তৈরি হবে! কত আলো জ্বলবে! কি রকম শাঁক বাজবে!

পিন্টু উৎফুল্ল হ'য়ে ব'ললে, আমি তা হ'লে সেদিন কি করব মাসিমা ?

তুমি! তুমি সেদিন যত লোক নেমন্তন্ন খেতে আসবে, তাদের জল দেবে, কেমন ?

আচ্ছা তাই হবে।

তারপর সে একটু ভেবে বললে, হাবু খেতে আসবে মাসিমা ?
হাবু ! তা তুমি যদি তাকে নেমন্তন্ন কর, আসবে বই কি !
পিন্টু গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললে, কি বল মাসিমা. ও আসুক ? কাগজ ছিঁড়েছে তো কী হয়েছে।
সে তো বটেই।
পিন্টু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠল, তবে হাবুকে নেমন্তন্ন ক'রে আসি ?
না, আজ নয়। আমি যেদিন বলব, সেদিন ক'রে এস।
তোমাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি বলতে হবে মাসিমা।

১২

আরতির বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেল। পাত্রপক্ষ দেখতে খুব ভাল নয় ব'লে খুঁত তুলেছিলেন। অপরেশবাবু গুড় ঢালতেই খুঁত নিখুঁত হ'য়ে উঠল।
বিয়ের দিন পিন্টুর কি সে ফুর্তি! সারাদিন সে চরকির মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার মোটে ফুরসত নেই। জালায় জল তোলা হচ্ছে, সেখানে পিন্টু! বড় বড় মাছ কোটা হচ্ছে, সেখানে পিন্টু! এই রকম কত জায়গায় তাকে দাঁড়িয়ে ব'সে থাকতে হচ্ছে!
আরতির মনটা আজ বিশেষ খারাপ। পিন্টুর জন্যে তার ভীষণ মন কেমন করতে লাগল। অন্যদিন সকাল হ'লেই পিন্টু 'মাসিমা' ব'লে উপস্থিত হ'ত। আজ চারিদিকের হইচই-এ সে এমন মেতে উঠেছিল, তার হুঁশ ছিল না। আরতি মাঝে মাঝে এসে পিন্টু কি করছিল. দেখে যাচ্ছিল। বেলা এগারটা বাজতে আরতিকেই পিন্টুকে ডাকতে হ'ল।
সে এসে আশ্চর্যের সঙ্গে বললে, মাসিমা, কত বড় মাছ এসেছিল, দেখেছ ?
দেখেছি। কিন্তু তুমি আজ আমার কাছে আসনি কেন ?
আসব কি ক'রে! একটু আগে যে আমি জালায় জল তুলছিলাম, আমাকে তো সকলকে জল দিতে হবে!

আরতি পিন্টুকে কাছে টেনে এনে বললে, তুমি তা হ'লে ভয়ানক কাজের ছেলে হয়েছ বল! এখন চান ক'রে এসে ভাত খেয়ে নাও। অবেলায় খেলে অসুখ করবে।

আমি তোমার সঙ্গে ভাত খাব মাসিমা?

আমার যে আজ ভাত খেতে নেই পিন্টু।

কিন্তু ভাত না খেলে তোমার যদি অসুখ করে?

আমরা যে বড়, আমাদের একদিন ভাত না খেলে অসুখ করে না। যাও পিন্টু, তাড়াতাড়ি ওপর থেকে চান ক'রে এস।

তাড়াতাড়ি খাবার পাট চুকিয়ে দিয়ে পিন্টু এটায় ওটায় আবার মেতে উঠল। বিকালবেলায় নীচের গলিটায় তেরপল টাঙ্গানো দেখতে গিয়ে দেখে, হাবু সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার তখুনি হাবুকে নেমন্তন্ন করবার কথা মনে প'ড়ে গেল।

পিন্টু ডাকলে, হাবু শোন্।

হাবু এগিয়ে এসে উত্তর করলে, কি রে?

তুই একটু দাঁড়া, আমি মাসিমাকে এক্ষুণি জিজ্ঞাসা ক'রে আসছি।

হাবুকে কোন উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়েই পিন্টু ওপরে ছুটে গেল। আরতির কাছে গিয়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, মাসিমা, হাবুকে নেমন্তন্ন ক'রে আসব?

হাবুকে নেমন্তন্ন করার সম্বন্ধে, আরতির সমস্ত কথা মনে প'ড়ে গেল। সে উত্তর করলে, আমারি তোমাকে বলতে ভুল হ'য়ে গেছে। তুমি এখুনি হাবুকে নেমন্তন্ন ক'রে এস।

পিন্টু তীরের মত নীচে নেমে গিয়ে হাবুকে বললে, আজকে মাসিমার বিয়ে, তোর আজ নেমন্তন্ন, তুই খেতে যাবি। হাবু, মাসিমা বলেছে আমি সকলকে জল দেবো, তোকেও দেবো।

আমি ভাই নুন দেবো।

কিন্তু মাসিমা তো তোকে নুন দেবার কথা বলে নি! আচ্ছা দাঁড়া, মাসিমাকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আসছি।

আজ পিন্টু হাবুর ওপর খুবই সুপ্রসন্ন। পিন্টু আবার দৌড়ে গিয়ে দেখে, একজন মহিলা আরতির চুল বেঁধে দিচ্ছে আর আরতিকে ঘিরে সকলে ব'সে আছে। পিন্টু দূর থেকে ডাকলে, মাসিমা শোন?

এধারে এস।

তুমি এধারে শোন না?

অগত্যা আরতিকে উঠে আসতে হ'ল। সে এসে বললে, কি বলছ?

হাবু বলছে, ও নুন দেবে।

তুমি বুঝি বলেছ তুমি জল দেবে?

হ্যাঁ।

তা হ'লে হাবু নুন দিক, কি বল?

এমন সময় অপরেশবাবু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। পিন্টুকে দেখে তিনি বললেন, কি হে টাটকা ছেলে, মাসিমাকে কি বলছ?

আরতি বললে, আজ যখন লোক খাবে বাবা, পিন্টু জল দেবে, আর নীচেকার হাবু নুন দেবে।

অপরেশবাবু সহাস্তে বললেন, তাই নাকি, তা হ'লে তো কাজটা আমার অনেকটা হালকা হ'য়ে গেল, দেখছি!

পিন্টু নীচে গিয়ে হাবুকে সুসংবাদ দিলে। দেখতে দেখতে পিন্টুতে হাবুতে গলায় গলায় ভাব হ'য়ে গেল। তাদের মধ্যে নানা কথাবার্তা হ'ল। তারপর হাবু জিজ্ঞাসা করলে, তোকে মাসিমা খুব ভালবাসে, না রে পিন্টু?

হ্যাঁ।

হাবু আবার বললে, তুই মাসিমা যখন শ্বশুরবাড়ি যাবে, কাঁদবি? পিসীমা শ্বশুরবাড়ি যেতে আমি ভাই খুব কেঁদেছিলাম।

পিন্টুর কথাগুলো ভাল লাগল না। সে ব'লে উঠল, মাসিমা তো ওপরে

থাকে, মাসিমা যাবে কেন ?

দূর বোকা, বিয়ে হ'লে যে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয় !

শ্বশুরবাড়ি কি রে হাবু ?

তুই বুঝি জানিস না ! যে বিয়ে করতে আসবে না, তার বাড়ি।

না মশাই, তুমিই জান না, মাসিমা আমাকে বলেছে, সকলের বিয়ে হয় তাই মাসিমারও হবে।

আচ্ছা দেখিস, কাল মোটরগাড়ি ক'রে মাসিমাকে যখন নিয়ে চ'লে যাবে ! পিন্টু গুম হ'য়ে গেল। তার ফুর্তি কর্পূরের মত উবে গেল। সে হাবুর সঙ্গে আর কোন কথা না ব'লে গলির ওপর সাজানো চেয়ারের একখানিতে ব'সে পড়ল।

এদিকে অনেকক্ষণ কেটে যাওয়াতে, আরতি পিন্টুকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল।

আরতির মা পিন্টুর কথা শুনে বললেন, ও আর কোথায় যাবে, এখানে ওখানে নিশ্চয়ই আছে। আর তোকে আমি বলি অরু, তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস, পিন্টু, পিন্টু আর পিন্টু ! আজ বাদে কাল শ্বশুরবাড়ি যাবি, তখন কি পিন্টু তোর সঙ্গে যাবে ?

আরতি মা-র কথা শুনে চুপ ক'রে চ'লে গেল।

১৩

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় হয়। আরতিকে সাজানো হ'য়ে গেছে। পিন্টুর কিন্তু দেখা নেই। আরতি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। সে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। কোথাও পিন্টুকে দেখতে না পেয়ে সে অপরেশবাবুকে বললে, বাবা, পিন্টুকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

ও আসে নি ! এই তো কিছুক্ষণ আগে দেখলাম নীচে চেয়ারে ব'সে আছে ! ওপরে তো আসেনি। আমি বাবা তেতলাটা একবার চট ক'রে দেখে

আসব ?

আরতির মা কাছেই ছিলেন। শুনে বললেন, এখন যাবি কি! এক্ষুণি বর আসবে! আর এই ভর সন্ধ্যেবেলায় তোকে আমি কোথাও যেতে দেবো না।

আমি একবার দেখেই চ'লে আসব মা।

না, তোকে যেতে হবে না।

অপরেশবাবু বললেন, যাক না বাপু, একবার চট ক'রে দেখেই আসুক না। এ তো আর তোমার হিল্লি-দিল্লি নয়!

আরতির মা রেগে বললেন, বেশ, তবে তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর। তিনি চ'লে গেলেন। আরতি ওপরে উঠে দেখে, পিন্টু সেই হাফ-প্যান্ট পরা অবস্থাতেই ঘুমচ্ছে আর সরলবাবু কি লিখছেন।

অন্য সময় হ'লে, এই সাজ-গোছ করা অবস্থায় সরলবাবুর সামনে কিছুতেই সে বেরত না, আজ পিন্টুকে সন্ধ্যেবেলায় ঘুমতে দেখে সে আতঙ্কিত হ'য়ে উঠল। সে নিজের সাজ-গোছ করা অবস্থার কথা সম্পূর্ণ বিস্মরণ হ'য়ে ঘরে ঢুকে বললে, পিন্টু যে আজ এই অসময়ে ঘুমচ্ছে ?

সরলবাবু আরতিকে এই অবস্থায় দেখে একটু আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সহজভাবেই বললেন, কি জানি ; এসে দেখলাম, নীচের গলিতে একটা চেয়ারে ব'সে ঢুলছে, উপরে নিয়ে আসতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

আরতি তাড়াতাড়ি গিয়ে পিন্টুর গায়ে হাত দিয়ে বললে, না, গা তো বেশ ভাল !

এই সময়ে শাঁক বেজে উঠল। 'বর এসেছে', 'বর এসেছে' ব'লে ভয়ানক চিৎকার হ'তে লাগল। সরলবাবু বললেন, আপনি যান, আমি ও উঠলেই নীচে নিয়ে যাব।

আবার ঘন ঘন শাঁক বাজতে লাগল। আরতি ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতে পিন্টু ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। সামনে সরলবাবুকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, মাসিমার বিয়ে হ'য়ে গেছে?

সরলবাবু বললেন, না, এখনো হয় নি। তুমি ওঠ, তুমি কি করছ, মাসিমা যে খবর নিতে এসেছিলেন।

আমার কিছু ভাল লাগছে না বাবা।

পিন্টুর মুখে সরলবাবু এরূপ অদ্ভুত কথা কখনো শোনেন নি। তিনি নির্বাক হ'য়ে পিন্টুর মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন, সারাদিন ছুটোছুটি করার পর সন্ধ্যেবেলায় ঘুমানোর জন্যে হয়তো এরূপ হয়েছে। তিনি পিন্টুকে বললেন, সন্ধ্যেবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছ কিনা, তাই শরীরটা ভাল লাগছে না। নাও, উঠে পড়।

পিন্টুর গড়িমসি দেখে সরলবাবু জোর ক'রে পিন্টুর হাত ধ'রে নীচে নেমে গেলেন। সন্ধ্যা লগ্নে বিয়ে। বিয়ে তখন আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

অপরেশবাবু কাছেই একটা চেয়ারে ব'সে তদারক করছিলেন। সরলবাবু ও পিন্টুকে দেখে তিনি ব'লে উঠলেন, এস সরল, বস। তোমার জিনিস পত্র যোগাড়ের জন্যেই আজ আমার মানসম্ভ্রম বজায় রইল, না হ'লে কি যে হ'ত, ভগবানই জানেন!

সরলবাবু পিন্টুকে নিয়ে একখানি চেয়ারে বসলেন। এবার পিন্টুর দিকে ভাল ক'রে চোখ পড়াতে অপরেশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, টাটকা ছেলে, তোমায় বাসী বাসী দেখাচ্ছে কেন?

সরলবাবু উত্তর করলেন, সন্ধ্যেবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই বোধ হয় এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে।

ভেতর থেকে অপরেশবাবুর ডাক পড়ল। তিনি এক্ষুণি আসছেন ব'লে উঠে গেলেন।

অদূরেই বিয়ে হচ্ছিল। পিন্টু চেয়ারে ব'সে আরতিকে ভাল ক'রে দেখতে

পাচ্ছিল না। তাই সে একটু উঠে গিয়ে দাঁড়াল। হাবু সন্ধ্যে থেকে নুন পরিবেষণ করবার আশায় পিন্টুকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সে পিন্টুকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বললে, ওপরে পাতা হচ্ছে, চল্, জল দিবি চল্।

আমি জল দেবো না।

তবে যে তুই বলেছিলি, তুই দিবি!

না, আমি দেবো না।

হাবু দুঃখের সঙ্গে বললে, আমি তা হ'লে কি ক'রে নুন দেবো!

পিন্টুর কথা কইতে ভাল লাগছিল না। সে চুপ ক'রে আরতিকে দেখতে লাগল। হাবু বিষণ্ণ মনে চ'লে গেল।

অপরেশবাবু ফিরে এসে সরলবাবুকে বললেন, সরল, পাতা হ'য়ে গেছে। তুমি বাবা টাটকা ছেলেকে নিয়ে, খেয়ে নাও। এ ব্যাচেই খাও। মা আমার বসবার আগে পইপই ক'রে ব'লে গেছে, পিন্টু এলেই যেন ওকে খাইয়ে দেওয়া হয়। যদি শোনে পিন্টু এখনো খায় নি, মুখে হয়তো কিছু বলবে না, মনে মনে ভয়ানক দুঃখ পাবে।

সরলবাবু পিন্টুকে নিয়ে খেতে বসলেন। পিন্টুর খেতে মোটে ইচ্ছা ছিল না, সে খাবারগুলো নিয়ে আত্মভোলা হ'য়ে নাড়াচাড়া করছিল। সরলবাবু পিন্টুকে বললেন, কি পিন্টু খাচ্ছ না যে?

পিন্টু এক টুকরো লুচি মুখে পুরে ওয়াক ওয়াক করতে লাগল।

সরলবাবু বললেন, তোমার দেখছি খিদে নেই। তুমি খেয়ো না।

পিন্টু চুপ ক'রে ব'সে রইল। সকলের খাওয়া শেষ হ'লে, পিন্টু সরলবাবুর সঙ্গে নীচে নেমে দেখে, যেখানে বিয়ে হচ্ছিল, সেখানে আরতি নেই। সে অস্থির হ'য়ে উঠল।

সরলবাবু পিন্টুর অস্থিরতা দেখে চিন্তিত হ'য়ে বললেন, পিন্টু, তুমি কি বমি করবে?

পিন্টু, এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, মাসিমা

কোথায় ?

অপরেশবাবু কাছেই ছিলেন, বললেন, তোমার মাসিমা ওই পাশের ঘরে আছে, তুমি যাও।

পিন্টু পাশের ঘরের দিকে গেল। অপরেশবাবু সরলবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। পিন্টু পাশের ঘরের চৌকাট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সাপ দেখলে মানুষ যেমন লাফিয়ে ওঠে, সেই রকম লাফিয়ে উঠে, পিছু হেঁটে এল। তারপর সামনে একটা মাটির গেলাস প'ড়ে থাকতে দেখে, সে যন্ত্রচালিতের মত সেটা কুড়িয়ে নিয়ে, ছুটে চৌকাট পর্যন্ত গিয়ে ভেতরে সেটা সজোরে ছুঁড়লে। ভেতরের আলমারির কাঁচ ঝনঝন ক'রে ভেঙ্গে পড়ল। পিন্টু ছুটে পালাল না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের ভেতরে একটা সমবেত আর্তনাদ উঠল। অপরেশবাবু, সরলবাবু এবং আরো সকলে ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। আরতির মা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বললেন, এক্ষুণি মেয়ে জামাই আমার খুন হয়েছিল।

তারপর এগিয়ে এসে পিন্টুকে তিনি ঠাস ক'রে এক চড় কষিয়ে দিলেন।

অপরেশবাবু বললেন, ওকে মারছ কেন, ও কি করেছে ?

ও কী করেছে! ওই তো গেলাস ছুঁড়ে মেয়ে জামাইকে আর একটু হ'লে খুন করেছিল।

সরলবাবু পিন্টুর উপর রেগে গেলেন। তিনি পিন্টুর কাঁধ দুটো ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, কেন গেলাস ছুঁড়েছিলি ?

পিন্টু কোন উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল। সরলবাবু ভয়ানক রেগে বললেন, উত্তর দে, নইলে তোকে আজ আমি পুঁতে ফেলব !

পিন্টুকে তবুও নীরব দেখে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি পিন্টুকে পটাপট চড় কষাতে লাগলেন।

আরতি এতক্ষণ নতুন পরিবেশের মধ্যে কোন রকমে ধৈর্যধারণ করেছিল, সে আর থাকতে পারলে না। গাঁটছড়া খুলে ফেলে রেখে, ছুটে এসে মা-র

দিকে চেয়ে বললে, সকলে মিলে ছেলেটাকে মেরে ফেল! নাও, তুমিও আবার শুরু ক'রে দাও!

আরতির মূর্তি দেখে সকলে পিছিয়ে গেল। পিন্টু সেই যে গেলাস ছোঁড়ার পর থেকে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, মাথা আর সে তোলে নি।

আরতি পিন্টুর দিকে ঘুরে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি গেলাস ছুঁড়েছিলে কেন পিন্টু?

পিন্টুর এতক্ষণে বাঁধ ভাঙ্গল। সে হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বললে, আমি তোমাকে মারতে যাইনি, আমি ওকে মারতে গিয়েছিলাম।

এই ব'লে সে বরকে দেখিয়ে দিলে। তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বললে, ও, কেন মা-র মত তোমার মাথায় সিঁদুর দিয়ে তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে!

সকলে শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

আরতি পিন্টুকে কাছে টেনে এনে, ওর মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। দুজনের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আতিথ্য

১

সুধীর তার স্বভাবসুলভ সারল্যের সঙ্গে উত্তর করলে, বাসু, আমার কাছে ভাই কিন্তু বেশী টাকা নেই।

তুই কত যোগাড় করতে পারবি ?

মেরে-কেটে গোটা পঞ্চাশ।

বাসু সুধীরের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেয়ারখানা সুধীরের চেয়ারের একেবারে কাছে টেনে এনে বললে, গোটা পঞ্চাশ পারবি তো, তা হ'লেই হবে! আমিও গোটা পঞ্চাশ দেবো। এই একশ টাকায় আমি তোকে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসব।

তুই কি যে বলিস তার ঠিক নেই, এই একশ টাকায়!

আশ্চর্য হচ্ছিস। সারা ভারতবর্ষটা বলা যদিও আমার অত্যুক্তি হয়েছে, তবে আমি তোর কাছে হলপ ক'রে বলব, ওই একশ টাকায় যতদূর ট্রেন ভাড়া, টাঙ্গা ভাড়া চলবে, ততদূর তোকে আমি নিশ্চয়ই ঘুরিয়ে আনতে পারব।

সুধীর সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, আর থাকা খাওয়া ? আচ্ছা, থাকাটা নয় ধরমশালায় চলল, কিন্তু খাওয়াটা ?

বাসু হোহো ক'রে হেসে উঠল। সুধীর একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'লে উঠল, হাসছিস যে!

বাসু গম্ভীর হ'য়ে বললে, না কিছু নয়, এমনি। আচ্ছা দাঁড়া, আমি এক্ষুণি আসছি।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে, সুধীরের হাতে একখানি বাঁধানো ছোট নোটবুক দিয়ে বাসু বললে, এইটি হচ্ছে আমার বেড়ানোর গীতা।

বেড়ানোর গীতা!

বাসু নির্বিকার চিত্তে বললে, হ্যাঁ গীতা, বেড়ানোর গীতা। এতেই আমার বেড়ানোর মূলমন্ত্র লেখা আছে। এখন প'ড়ে যা।

সুধীর নোটবুকের পাতা একখানার পর একখানা ওলটাতে লাগল। খানকতক পাতা ওলটাবার পর সে বললে, এতে তো দেখছি কতকগুলো জায়গার ও লোকের নাম লেখা রয়েছে!

হ্যাঁ। কিছু মগজে ঢুকেছে?

কিছু তো বুঝতে পারছি না!

সূচিপত্র দেখে উপস্থিত বেনারসের পাতাটা খোল।

সুধীর একটু আশ্চর্য হ'য়ে বাসুর কথামত সূচিপত্র দেখে পঁচিশ নম্বরের পাতাখানা খুললে। পাতাখানার ওপরে বেনারস শিরোনামা রয়েছে আর শিরোনামার তলায় আটজন ভদ্রলোকের ঠিকানা সমেত নাম লেখা রয়েছে। বাসু জিজ্ঞাসা করলে, পেয়েছিস?

হ্যাঁ।

যে যে ভদ্রলোকদের নামে টিক দেওয়া নেই, ওঁদের যে কোন একজনের ওখানে গিয়ে উঠলেই হবে।

কিন্তু টিক দেওয়ার মানে?

হাতি ঘোড়া কিছু নয়। টিক দেওয়ার মানে হচ্ছে—আমি ওঁদের ওখানে এর আগে গিয়ে থেকে এসেছি। এবার আর ওঁদের বিরক্ত করব না।

ওঁদের সঙ্গে তোর বুঝি খুব হৃদ্যতা ছিল?

হৃদ্যতা ছিল ঠিক বলা চলে না, তবে হৃদ্যতা ক'রে নিতে হয়েছিল।

সে কি রে ! এবার যাঁর ওখানে উঠবি, তাঁর সঙ্গেও কি হৃদ্যতা ক'রে নিবি !
হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি ?
আমি এ অবস্থায় গিয়ে থাকতে পারব না। লোকে মনে করবে কি ! তার চেয়ে না বেড়ানোই ভাল।
ছেলেমানুষি করিস নে সুধীর। আমার এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আছে, এ জায়গায় কেউ কিছু মনে করে না। এ সব আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য, ভ্রম। সুধীর, বিদেশে তো কখনো যাস নি তো বুঝবি কি ! একটু হৃদ্যতা হ'য়ে গেলে দেখবি, ওঁরা আমাদের সঙ্গর জন্যে কী নিবিড় কামনাই না করেন। আমরা কেন আমাদের সংস্কৃতি, গতি, ছন্দের সঙ্গে মিশতে ওঁদের বাধা দেবো ? আমরা কোন্ অধিকারে দেবো শুনি ? বাঙ্গলার সঙ্গে ওঁদের নাড়ীর টানের সম্পর্ক আমরা তো অস্বীকার করতে পারি না !
না না বাসু, আমি অনাহূতের মত যেতে পারব না। তার চেয়ে টাকা পয়সা যোগাড় ক'রে পরে গেলেই চলবে।
পাঁচ বছর মাষ্টারি ক'রে একেবারে মাথাটা নিরেট ক'রে ফেলেছিস ! আচ্ছা, এতে অনাহূত রবাহূতের প্রশ্নটা ওঠে কি ক'রে ? কথা হচ্ছে, যাঁদের ওখানে আমরা উঠব, তাঁরা আমাদের কি দৃষ্টিতে দেখবেন, এই তো ? আমার যা বাস্তব জ্ঞান আছে, তাতে আমি জোর ক'রেই তোকে বলতে পারি, তাঁরা আমাদের খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে পারেন না। আমরা সমাজবদ্ধজীব, আমাদের এক সঙ্গে বাস করাই তো সংস্কারগত নিয়ম ? প্রথমটা হয়তো একটু আধটু খটমট ঠেকবে, তারপর দেখবি সব জল হ'য়ে যাবে।
সুধীর পরম বিস্ময়ে বাসুর দিকে চেয়ে রইল। বাসু উৎসাহভরে বলতে লাগল, আমার কথায় বিস্ময়প্রকাশ করবার কিছু নেই সুধীর। মানুষের সামাজিক ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবি, মানুষ অনেক দেখে শুনে, অনেক অসুবিধার মধ্যে মানুষ হ'য়ে, তবে না এই সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে বাস করার নিয়ম নিজেরাই ঠিক করেছে।

কিন্তু সজ্ঘবদ্ধতা আর ঘাড়ে পড়া কি এক জিনিস ?

এ দুটো এক জিনিস নয় এটা সত্যি। কিন্তু তুই যাকে ঘাড়ে পড়া বলছিস, সে মোটেই ঘাড়ে পড়া নয়, আমি তাকে বলব পরিচিত হওয়া। পরিচয়ই হচ্ছে সজ্ঘবদ্ধতার ঠিক আগেকার ধাপ।

বেশ তো ! বাড়িতে পাতা পেতে পরিচয় নাই বা হ'ল। অন্য কোন জায়গায় পরিচয় হ'ক।

বাড়ি ছাড়া অন্য জায়গায় পরিচিত হবার সুবিধে কোথায় ? একজনকে না একজনকে প্রথমে ঘা তো মারতেই হবে। আমরা যখন ওখানে যাচ্ছি, আমরাই প্রথমে ঘা মারব।

সুধীর এইবার হেসে ফেলে বললে, হ্যাঁ রে, তোর লজ্জা করে না ?

লজ্জা কিসের ?

তুই বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলিস, চলা ফেরা করিস, একটুও বাধ বাধ ঠেকে না ?

বাধ বাধ ঠেকবে কেন ! একজন ভদ্রলোক আর জন ভদ্রলোকের বাড়িতে উঠবেন, লাভ উভয়ের। যিনি উঠবেন, তাঁর পয়সা বাঁচবে, আর যাঁর বাড়িতে উঠবেন, তিনি নতুন সঙ্গী পাবেন। একঘেয়ে জীবন যাপনের হাত থেকে নিজেকে অন্তত দিনকতকের জন্যে সাঁতলে নিতে পারবেন।

সাঁতলে তো নেবেন, কিন্তু শরীরও তো ঝলসাবে !

তাঁদের চলা সংসারে এমন কিছু খরচ হবে না যাতে তাঁদের শরীর ঝলসাবে, বরং আমাদের উপস্থিতি তাঁদের মন চাঙ্গা রাখবে। ফলে তাঁদের উৎসাহ, নবোদ্যম রীতিমত বেড়ে যাবে।

আর কিছু না হ'ক, ওকালতি ক'রে তুই চোকা চোকা বুলি আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিস।

বাসু হেসে বললে, তুই নির্বিবাদে আমার হাতে সব ছেড়ে দে। বেড়িয়ে বেড়িয়ে হাড় পাকিয়ে ফেললাম। দেখবি, এক একবার লাঠি চালাব, সাপও

মরবে, অথচ লাঠি ভাঙা চুলোয় যাক, লাঠির গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটবে না।
লাঠির গায়ে হয়তো আঁচড় পড়বে না বাসু, কিন্তু আমি অক্ষত দেহ নিয়ে
ফিরলে বাঁচি।

২

বাসু, সুধীর প্রথমে বেনারস গেল। তারা জটাধরবাবুর বাড়িতে উঠল।
বাসু, জটাধরবাবুর পিসতুতো ভায়ের ছেলের বন্ধু। জটাধরবাবুর কাছে সে
সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাসু এমন নিবিড় ঘনিষ্ঠতার জাল
বিস্তার করলে, জটাধরবাবু 'বাসু' বলতে অজ্ঞান হ'য়ে পড়তে লাগলেন।
বাসু এই ফাঁকে, জটাধরবাবুকে জ্যাঠামশাই ব'লে নিজেদের অবস্থান অতি
সহজ ক'রে নিলে। অনভ্যস্ত সুধীর এ অভিনয়ে যোগ দিতে লজ্জা ও
সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। সে সর্বদা জটাধরবাবুকে এড়িয়ে চলতে
লাগল। চারদিন থাকবার পরও জটাধরবাবুর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া
সম্ভব হ'ল না। বিদায়ের দিন দু দুবার পিছিয়ে গেল। অবশেষে
অতিকষ্টে ফেরবার মুখে আবার আসবে কথা দিয়ে বাসু ও সুধীর আগ্রার
দিকে রওনা হ'ল।

৩

ট্রেনের আগ্রা পৌছুতে আর দেরি নেই। বাসু, সমস্ত জিনিসপত্র গোছগাছ
ক'রে তৈরী হ'য়ে একটু হেসে সুধীরকে উদ্দেশ ক'রে বললে, তোর স্নায়ুমণ্ডল
কি রকম রে?

স্নায়ুমণ্ডল!

হ্যাঁরে, লজ্জা, ভয়, 'কিন্তু' 'কিন্তু' ভাবের জন্মস্থান।

সুধীর হেসে বললে, এখনো তো সবল ব'লে মনে হচ্ছে।

আর দিনকতক আমার সঙ্গে ঘুরলে দেখবি, ও দুর্বল হ'তে জানে না।

এই ব'লে বাসু হাসতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে হাসি থামিয়ে পকেট থেকে বাঁধানো নোটবুকটা বের ক'রে আগ্রার পাতাখানা খুলে সে গম্ভীর হ'য়ে নিবিষ্টমনে পড়তে লাগল।

সুধীর জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছিস?

এবার ভাবছি নিজের বন্ধুর বাড়িতেই উঠব।

তোর সঙ্গে বুঝি ল কলেজে পড়ত?

না রে না, ল কলেজে নয়, বাল্যবন্ধু। আমার তখন আট বছর বয়স, সে বাইশ তেইশ বছর আগেকার কথা। ওরা আমাদের কলকাতার বাড়ির পাশে দিনকতক ভাড়া ক'রে ছিল। আমার সব কথা ভাল মনে নেই, মা-র কাছে শুনেছি, ওরা খুবই ভাল লোক ছিল।

ওদের কথা ভাল মনে নেই, অথচ ওদের ওখানে গিয়ে উঠবি!

তাতে কি হয়েছে! পরিচয় দেবো।

আমি ওখানে উঠতে পারব না, আমি হোটেলে গিয়ে উঠব, তুই বরং যাস।

চোখের সামনে দেখলি বেনারসে নেট সত্তর টাকা বাঁচিয়ে ফেললাম, অথচ তুই এই রকম কথা বলছিস!

সত্তর টাকা!

তা নয় তো কি। আমরা ওখানে সাত দিন ছিলাম। প্রথম শ্রেণির খাওয়া থাকায় কমপক্ষে এক একজনের গড়পড়তা পাঁচ টাকা হিসেবে ধরলে, সাত দিনে কত হয়?

যতই হ'ক, আমি আগ্রায় গিয়ে ওখানে থাকতে পারব না। তাতে—

বাধা দিয়ে বাসু বললে, তুই তা হ'লে বলতে চাস, ছেলে বেলার বন্ধুত্ব কিছু নয়?

আরে বাবা, বন্ধুত্ব হ'ল কই, ওরা তো মোটে দিনকতক তোদের বাড়ির পাশে ছিল!

বন্ধুত্ব যখন হয়, অল্প দিনেই হয়। হাজার বছরে বন্ধুত্ব হয় না, বরং চ'টে যায়।

কিন্তু—

কোন কিন্তু নেই সুধীর, তুই জানবি, ছেলেবেলার বন্ধুত্বই খাঁটি বন্ধুত্ব. নিষ্পাপ বন্ধুত্ব, আর সব ভেজাল, কম আর বেশি।

আর কোন কথা হ'ল না। ট্রেন আগ্রা সিটি ষ্টেসনে প্রবেশ করলে। ভিড় কমতে একখানা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে, বাসু, সুধীরকে নিয়ে কালী বাড়ির দিকে রওনা হ'ল। কালী বাড়ির কাছে টাঙ্গা আসতে, বাসু টাঙ্গা থামিয়ে সুধীরকে একটু বসতে ব'লে নেমে গেল।

কাছেই একটা দোকান থেকে ঠিকানাটার হদিস জেনে সে এগতে লাগল। যথাস্থানে পৌঁছে দেখলে, সেই বাড়ির সামনে একখানি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, গলায় স্টেথোসকোপ ঝুলিয়ে মোটরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন যুবক একটা ব্যাগ গাড়ির মধ্যে রেখে ভদ্রলোকের হাতে কি যেন গুঁজে দিলে। বাসু উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল। ভাবলে, যায় বুঝি সব ফসকে, আবার অসুখ বিসুখ কেন বাবা!

মোটর চ'লে গেল। বাসু সাহস সঞ্চয় ক'রে একটু এগিয়ে যুবককে জিজ্ঞাসা করলে, এটা কি অক্ষয়বাবুর বাড়ি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকে চান?

তাঁর ছোট ভাই অনিলকে।

যুবকটি সবিস্ময়ে বললে, আমারই নাম তো অনিল! আপনি কোথা থেকে আসছেন?

অ্যাঁ, তুইই অনিল!

তারপর এগিয়ে গিয়ে সে অনিলের কাঁধে হাত রেখে বললে, তুই ভয়ানক বদলে গেছিস তো! একেবারে চেনবার জো নেই! আমাকে মনে পড়ে? আমি বাসু রে, কলকাতায় হালসিবাগানে তোরা যে বাড়িতে থাকতিস, তার পাশের বাড়িতে থাকতাম। কত খেলা করতাম, মারামারি করতাম, মনে নেই!

অনিল একটু ভেবে হেসে বললে, এইবার মনে পড়েছে, তুমি তো পেটুক ছিলে?

এই দেখ, আবার তুমি! ছেলেবেলাকার বন্ধু কখনো তুমি হয় রে? স্রেফ তুই, বুঝলি?

দু জনেই হেসে উঠল। বাসু জিজ্ঞাসা করলে, তারপর তোদের খবর কি? দাদা, বৌদি কেমন আছেন?

দাদা তো ভালই, বৌদি হার্টের ব্যায়রামে ভুগছেন।

বৌদির অসুখ! চেহারা তো ভাই বেশ ভালই ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ছে, ও রকম স্বাস্থ্যবতী আমি খুব কমই দেখেছি।

বেশ তো ছিলেন। হঠাৎ মাস খানেক হ'ল ওঁকে পেড়ে ফেলেছে। ডাক্তারেরা বলেন, বেরিবেরির জন্যে।

ওর জন্যে ভাবিস নে। বেরিবেরি হ'লে ও রকম হার্টের একটু আধটু গোলমাল হ'য়েই থাকে। একটু সাবধানে থাকলে দেখবি সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

হঠাৎ অনিলের খেয়াল হ'ল, বাসুকে বাড়ির ভেতরে না নিয়ে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলা অসঙ্গত হচ্ছে। তাই সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, চল্ ভেতরে চল্, তারপর কথাবার্তা হবে খন।

আমি তো ভাই এখন আর অপেক্ষা করতে পারব না। বন্ধু হয়তো এতক্ষণ দিশেহারা হ'য়ে হোটেলে পায়চারি করছেন।

তুইও কি সেখানে উঠেছিস নাকি?

হ্যাঁ।

আমাদের বাড়ির ঠিকানা যখন জানিস, তখন হোটেলে উঠলি কেন?

আরে, আমি কি জানতাম আজই তোদের সঙ্গে দেখা করতে পারব!

না না না, ওসব চলবে না। আগ্রায় এসে আমরা থাকতে হোটেলে ওঠা চলবে না। বন্ধুকে নিয়েই এখানে আসতে হবে।

তুই বুঝছিস না!

আমার বুঝে কাজ নেই।

এই ব'লে অনিল বাসুকে এক রকম টানতে টানতেই ভেতরে নিয়ে গেল।

৪

অনিলের দাদা অক্ষয়বাবু তখন বাইরের ঘরে ব'সে চা পান করছিলেন, আর ব্যবসার খাতাপত্র দেখছিলেন। অনিল ঘরে প্রবেশ ক'রেই অক্ষয়বাবুকে উদ্দেশ ক'রে বললে, দাদা, দেখ কাকে ধ'রে এনেছি।

অক্ষয়বাবু অনিলের দিকে চাইতেই বাসু একটু এগিয়ে এসে অক্ষয়বাবুর পায়ের ধুলো নেবার জন্যে হেঁট হ'তেই তিনি পা দুটো গুটিয়ে ব'লে উঠলেন, থাক্, থাক্, হয়েছে, হয়েছে।

তারপর অনিলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আমি তো এঁকে ঠিক চিনতে পারছি না, অনিল!

এ আমার বাল্যবন্ধু। সেই যে কলকাতায় হালসিবাগানে আমরা ছিলাম, এরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। আগ্রায় এসে দেখা করতে এসেছে।

অক্ষয়বাবু হাসিমুখে বাসুকে বললেন, বেশ, বেশ, ভালই ক'রেছেন, এই তো চাই!

বাসু হাত পাকাতে পাকাতে বললে, আমাকে আর আপনি ব'লে লজ্জা দেবেন না দাদা।

অক্ষয়বাবু হাসলেন, তারপর অনিলকে বললেন, তা হ'লে তোমার ঘরটাতেই বন্ধুর থাকবার বন্দোবস্ত কর।

ও হোটেলে বন্দোবস্ত ক'রে এসেছে, দাদা। সঙ্গে একজন বন্ধু আছে কি না! একবার স্পর্ধাটা দেখেছ!

না না, তা কখনো হয়, আমরা যখন এখানে আছি! তুমি তোমার

বৌদির সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে আনো। পুরনো কথাবার্তা শুনলে তাঁর অসুস্থ শরীরে মনটা হয়তো কিছু চাঙ্গা হবে।

অনিল বাসুকে নিয়ে বৌদির কাছে গেল। বৌদি তখন শুয়ে ছিলেন। তিনিও বাসুকে চিনতে পারলেন না। তারপর আদ্যপান্ত সব শুনে বললেন, তুমি যে ভাই আমাদের মনে রেখেছ, এই আমাদের কত ভাগ্যি। আমার বরাত দেখ, তোমরা এলে, অথচ আমি কিছু করতে পারব না। তোমরা নিজেরাই সব ক'রে-কম্মে নিয়ো। আর যদি কিছু ত্রুটি হয়, অক্ষম বৌদিকে ক্ষমা ক'রো।

বাসু বললে, বরং ঠিক কথা বলতে কি, বৌদি, অনিলের ঠেলায়, আমিই তো আপনাদের ওপর রীতিমত অত্যাচার চালাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। ও সব কথা ব'লে আপনি আর আমার অপরাধের মাত্রা বাড়াবেন না।

বৌদি দুর্বল হাসির সঙ্গে তাড়াতাড়ি বললেন, ওসব কথা বলতে নেই, ভাই। মানুষই তো নারায়ণ, নারায়ণ কি কখনো অপরাধ করে!

বৌদির অসুস্থতার কথা বিবেচনা ক'রে আর কথা এগল না। অনিল বাসুর সঙ্গে যাবে ঠিক করলে, পাছে সে বন্ধুকে নিয়ে হোটেল ছেড়ে না আসে। কিন্তু বাসু তাকে বুঝিয়ে এক্ষুণি আসবে কথা দিয়ে একাই বেরিয়ে পড়ল।

সে দূর থেকে দেখে, সুধীর টাঙ্গা থেকে নেমে পায়চারি করছে। কাছে এসে সে বেশ বুঝতে পারলে, ওটা সুধীরের পায়চারি নয়, রীতিমত ছটফটানি।

সুধীর বাসুকে দেখতে পেয়েই ব'লে উঠল, এত দেরি করলি যে!

কথা কইতে গিয়ে দেরি হ'য়ে গেল। চল্, টাঙ্গায় উঠি।

দু জনে টাঙ্গায় উঠে বসল। বাসু টাঙ্গাওলাকে অনিলদের বাড়ির বিপরীত দিকে চালাতে বললে। সুধীর আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবি?

বন্ধুর বাড়িতে।

যে বন্ধুর বাড়িতে এইমাত্র গিয়েছিলি?

হ্যাঁ।

তা হ'লে এধারে চালাতে বললি!

ব'লে এসেছি, আমরা হোটেলে উঠেছি। একটু ঘুরে দেরি ক'রে না গেলে ধ'রে ফেলবে।

এতেও চালাকি খেলে এলি!

বাসু হাসতে লাগল। তারপর সে বললে চালাকি আর তেমন করতে হ'ল কোথায়! বন্ধুর বৌদি কি বললেন, জানিস? বললেন, 'মানুষই তো নারায়ণ, নারায়ণ কি কখনো অপরাধ করে।' আমিও তোকে বলব, নারায়ণ কখনো চালাকি করে রে!

বাসু জোরে হাসতে লাগল। সুধীর চুপ ক'রে ব'সে রইল। টাঙ্গা ঘুরে অনিলদের বাড়ির সামনে এসে থামতেই, অনিল বেরিয়ে এসে সুধীরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালে। রামচরণ এসে বাসুদের জিনিসপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে গেল।

বাসু টাঙ্গাওলাকে ভাড়া দেওয়ার জন্যে একখানা দশ টাকার নোট বের করতেই অনিল তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, ওদের কাছে দশ টাকার নোটের ভাঙানি পাওয়া যাবে না। তুই ওটা রাখ, আমি দিচ্ছি।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সকলে বাইরের বাড়ির দোতলায় উঠল।

অনিলের ঘর এই বাইরের বাড়ির দোতলায়। এই ঘরের নীচেই বৈঠকখানা। এ অংশে আর কোন ঘর নেই। সমস্ত বন্দোবস্তই আলাদা, সিঁড়ি, স্নানের ঘর, পায়খানা, সমস্তই।

অনিল বাসুদের সঙ্গে ক'রে সমস্ত দেখিয়ে দিলে।

সুধীর সম্পূর্ণ আলাদা বন্দোবস্ত দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বাসু সুধীরকে বসিয়ে রেখে, 'আসছি' ব'লে অনিল তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

সুধীর ব'লে উঠল, চেঞ্জ থাকতে টাঙ্গাওলাকে দশ টাকার নোট দেবার মানে?

বাসু হেসে উত্তর করলে, আচ্ছা, তুই এত ছোট জিনিসের দিকে নজর দিস কেন বল তো!

না বাসু, এত নীচে নামা ঠিক নয়।

বাসু হাসতে হাসতেই বললে, সুবিধের কি কোন ওপর নীচ আছে রে!

এমন সময় অনিল ফিরে আসতেই বাসু ব'লে উঠল, বৌদি এখন কেমন রে?

আর বলিস কেন! বৌদির হুকুম ছিল, তোরা এলেই খবর দিতে। তাই তো ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি বৌদি ঝেড়েঝুড়ে উঠে, পাঁড়েকে দিয়ে তোদের জন্যে খাবার তৈরি করাচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'আমার ভাই শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে, তাই একটু উঠলাম। আর দেখ, ওরা এসেছে, ছেলেমানুষ, পাঁড়েজীকে দিয়ে যদি তাড়াতাড়ি কিছু করিয়ে না দিই, ওদের কষ্ট হবে। বিদেশে বিভুঁইএ এসেছে!'

বাসু ব'লে উঠল, উনি অসুস্থ শরীর নিয়ে যদি এরকম করেন, তা হ'লে তো মুশকিল দেখছি!

তুই বৌদিকে ওকথা বলিস না, ঠেলাটা বুঝতে পারবি। নে, এখন হাত মুখ ধুয়ে নে, খাবার এসে পড়ল ব'লে।

অনিল সুধীরের দিকে চেয়ে বললে, সুধীরবাবু, আপনি মশায় আড়ষ্টভাব কাটিয়ে ফেলুন। কি যে ভাবছেন তার ঠিক নেই!

জলখাবারের পর্ব শেষ হবার কিছুক্ষণ পরে অক্ষয়বাবু স্বয়ং তদারক করতে এলেন। বাসু, অক্ষয়বাবুকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠল, দাদা, এই আমার বন্ধু সুধীর।

সুধীর নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়াতেই অক্ষয়বাবু প্রতিনমস্কার ক'রে ব'সে বললেন, আপনারা বসুন সুধীরবাবু।

তারপর তিনি ব'লে যেতে লাগলেন, এ আপনাদেরই বাড়ি, মোটে চক্ষুলজ্জা করবেন না। আমরা তো আছিই, তা ছাড়া যখন যা দরকার হবে, চেয়ে

নেবেন। যখন যা অসুবিধে হবে, মুখ ফুটে বলবেন। কোন রকম দ্বিধা বোধ করবেন না। অনিলের দুর্ভাগ্য ও দিন কতক আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। আজ এইমাত্র তার পেলাম, দিল্লিতে ওকে আজই রওনা হ'তে হবে, না হ'লে অনেক টাকা ক্ষতি হবে।

অনিলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, তোমার কোন ভয় নেই অনিল, তোমার বন্ধুদের কোনরকম অমর্যাদা হবে না, কোন রকম অসুবিধে ঘটবে না. তোমার হ'য়ে আমি নিজে সব দেখব। আমি ইতিমধ্যে কাল্লুকে ব'লে দিয়েছি, ও কাল সকালে তার টাঙ্গা নিয়ে আসবে। ও সব চেনে, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে। দু চার দিন এইভাবে চলুক, তারপর তুমি তো নিজেই এসে পড়বে, আর তার ওপর ছেলেরাও হয়তো ইতিমধ্যে মামার বাড়ি থেকে এসে পড়তে পারে, তারাও সঙ্গে নিয়ে বেরতে পারবে।

বিনা চেষ্টায় টাঙ্গার বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল শুনে, বাসু রীতিমত খুশী হ'য়ে উঠল। সে সে-ভাব গোপন রেখে বললে, আপনি এত হাঙ্গামা কেন করতে গেলেন দাদা? আপনি হয়তো মনে করেছেন আমরা এখনও সেই শিশুই আছি, টাঙ্গার বন্দোবস্তটা পর্যন্ত করতে পারব না!

অক্ষয়বাবু সহাস্যে বললেন, এতে হাঙ্গামার কি আছে, সবই তো মুখের ব্যবস্থা। আমার যদি শরীরে সামর্থ্য থাকত, আমিই তোমাদের নিয়ে ঘুরতাম। তোমরা বস, কথাবার্তা বল, আমি এখন উঠি। অনিল, তুমি তা হ'লে যাবার আগে সব বুঝেসুজে নিয়ো।

অক্ষয়বাবু চ'লে গেলেন। অনিলও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর নীচে নেমে গেল।

অনিল দিল্লি যাবার পর তিন দিন কেটে গেল। দাদা, বৌদির দরদী পরিচালনায় বাসুদের বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর কাটতে লাগল।

অক্ষয়বাবু প্রত্যহ নিজে এসে দেখাশুনা ক'রে যেতেন। তুচ্ছ ত্রুটি পর্যন্ত ঘটবার অবকাশ দিতেন না।

বাসু রাত্রে খাওয়ার পর প্রায় প্রত্যহই অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বৈঠকখানায় এসে বসত। নানারূপ গল্প-গুজবে আসর সরগরম ক'রে তুলত। নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নানারূপ রঙ্গিন তুলি বুলিয়ে এমনভাবে অক্ষয়বাবুর সামনে সে সে-গুলো ধরত, তিনি বিস্ময় বোধ না ক'রে থাকতে পারতেন না। বাসু তাঁর চেয়ে বয়সে ঢের ছোট হ'লেও তিনি তার অভিজ্ঞতাকে নিঃশব্দে শ্রদ্ধা জানাতেন।

সুধীর কিন্তু জটাধরবাবুর মতই অক্ষয়বাবুকে এড়িয়ে চলত। এঁদের অপূর্ব আতিথেয়তা, অমায়িক ব্যবহার, সরলতা, তাকে উৎপীড়িত ক'রে তুলত। সে নিজেকে বড় ছোট ব'লে মনে করত। বাসু অক্ষয়বাবুর কাছ থেকে প্রত্যহ ফিরে এসে, যখন তার কাছে সমস্ত কথা ব'লে কৃতিত্ব দাবি করবার চেষ্টা করত, বাস্তবিকই তার মন বিদ্রোহী হবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠত।

চার দিনে বাসু, সুধীর আগ্রা একরকম চ'ষে ফেললে। সেদিন রাত্রে ফিরে এসে বাসু ব'লে উঠল, অনিলটার আক্কেল দেখেছিস একবার! তিন দিন হ'য়ে গেল, অথচ ফেরবার নামটি নেই!

বোধ হয় ভদ্রলোক কাজে আটকে পড়েছেন।

সে তো বুঝতে পারছি। কাল্লু ব্যাটাও তো ফতেপুর সিক্‌রি যেতে রাজী নয়! কালকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বললে যে ওর ঘোড়া কমজোরি, অতদূর গিয়ে ফিরে আসতে পারবে না।

তুই ফতেপুর সিক্‌রিটাও কি অক্ষয়বাবুর ঘাড়ে চাপাবি নাকি?

দুধেতে আর আমরা ওইটুকু চোনা ফেলি কেন বল্?

সুধীর একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে, মনের মধ্যে বড্ড আবর্জনা ঢুকিয়েছিস বাসু, সাফ ক'রে ফেল, নইলে একদিন পস্তাতে হবে।

বাসু হেসে উঠল। সুধীর বিরক্ত হ'য়ে বললে, তুই কি যে যখন তখন হাসিস তার ঠিক নেই!

কাঁদবার কারণ না থাকলে কাঁদব কি ক'রে বল্?

আমি কাঁদতে বলছি না, আমি অকারণে হাসতে বারণ করছি।

হাসবার যথেষ্ট কারণ ছিল ব'লেই হেসেছি। তোর ধারণা, আমি ইচ্ছে ক'রেই ফতেপুর সিক্‌রিটা অক্ষয়বাবুর ঘাড়ে চাপাতে যাচ্ছি। কিন্তু তা নয়। এটা স্বাভাবিকভাবেই অক্ষয়বাবুর ঘাড়ে চাপবে। যেমন দিনের পর রাত, রাতের পর দিন আসে, সেই রকম টাঙ্গা বন্দোবস্ত করার পর ফতেপুর সিক্‌রির বন্দোবস্তটা আসে।

তার মানে!

মানে আর তেমন কিছু নয়, খুব সোজা। ধর্, আমরা খরচ ক'রে ট্রেনে যাব, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে একবার বলা দরকার। উনি শুনে কি উত্তর দেবেন? সে কি হয়, সে কি হয় ব'লে, নিজেই একটা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন না?

ওঁকে আগে থেকে বলার কি দরকার! আমরা রোজ যেমন বেরই, সেইরকম বেরব। বরং ঘুরে এসে বললেই হবে।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া হবে না? উনি শুনে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবেন? ওঁর বাড়িতে আমরা আছি, সমস্ত বন্দোবস্ত ওঁর মারফতই হচ্ছে, এখন আমরা ওঁকে আগে থেকে কিছু না ব'লে যদি কোন বন্দোবস্ত করি, ওঁকে দাগা দেওয়া হবে না! ওঁকে অকারণ মনঃকষ্ট দিয়ে লাভ কি!

হয়েছে, হয়েছে, আর বোঝাতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি।

না, তুই বুঝতে পারিস নি। তোর কথা আমি মেনে নিতে পারতাম যদি গোড়ার দিকে টাঙ্গার বন্দোবস্ত না হ'ত।

সুধীরের পক্ষে বাসুকে এঁটে ওঠা দুষ্কর। তাই সে আর কথা না বাড়িয়ে কাগজে মন দিলে। বাসুও বিছানার ওপর শুয়ে প'ড়ে নিরুপদ্রব বিশ্রাম উপভোগ করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাত্রের খাবার এসে পড়ল। খাওয়া শেষ ক'রে বাসু সুধীরকে বললে, চল্, অক্ষয়বাবুর কাছ থেকে ঘুরে আসি?

আমি খবরের কাগজটা পড়ি, তুই যা।

এই তো এতক্ষণ পড়লি, এখন থাক না!

আমার সব পড়া হয় নি।

কালকে তুই যাস নি, অক্ষয়বাবু তো ভেবেই খুন। আমি যখন বললাম, ও ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে উনি আশ্বস্ত হন।

আজও ওই কথা বলিস।

কচি খোকা হ'লে ওকথা রোজ রোজ বলা সাজত! চল্, ওঠ্, আর দেরি করিস নে। তোর ভয় নেই, আমি ফতেপুর সিক্রির কথাটা তোর সামনে পাড়ব না। সাধারণ কথা ক'য়েই চ'লে আসব।

তুই যা না। তুই তো একাই একশ!

সত্যি বলছি, স্রেফ বৌদি কেমন আছেন আর অনিলের খবরটা নিয়েই চ'লে আসব।

বৌদির নাম হ'তেই কাগজ পড়া বন্ধ রেখে সুধীর সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, আচ্ছা বাসু, তুই তো এই চার দিনের মধ্যে অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে একদিনও দেখা করলি না!

খবর তো রোজ অক্ষয়বাবুর কাছে পাই। রোগী মানুষকে জ্বালাতন ক'রে লাভ কি!

অপ্রয়োজনে গিয়ে লাভ কি, কি বলিস? অক্ষয়বাবুকে দিয়েই যখন সব কাজ হাসিল হ'য়ে যাচ্ছে!

না না, তা নয়। আমার বাবা ওসব নারায়ণ টারায়ণের প্যানপ্যানানি ভাল লাগে না!

কেন রে, মনটা দমিয়ে দেয়?

আর কথা বলা হ'ল না। সিঁড়িতে অক্ষয়বাবুর গলা শোনা গেল। সুধীর গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে কাগজ পড়তে লেগে গেল। বাসু উঠে প'ড়ে বাইরে গিয়ে বললে, আসুন দাদা।

তারপর অক্ষয়বাবুকে দেখতে পেয়ে সে অনুযোগের সুরে বললে, আপনি আবার কেন কষ্ট করতে গেলেন দাদা! আমরা তো আপনার কাছে যাব ব'লে পা বাড়িয়েই ছিলাম।

অক্ষয়বাবু ঘরে প্রবেশ করলেন। সুধীর উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে একখানি চেয়ার এগিয়ে দিলে। অক্ষয়বাবু প্রতিনমস্কার ক'রে ব'সে বললেন, তাতে কি হয়েছে। এই দেখ না, তোমাদের খাওয়ার সময় আমি একদিনও থাকতে পারি না। আজকে তাড়াতাড়ি ফিরব ব'লে সব ঠিকঠাক, বেরিয়েও পড়েছিলাম, হঠাৎ একটা কাজ এসে আমায় আটকে দিলে।

আপনি দাদা আমাদের জন্যে কিছু ভাববেন না। এ তো আমাদের নিজের বাড়ি।

সে তো বটেই। কিন্তু কি জান, থাকা দরকার। তার ওপর বাড়িতে বলছিল, তোমরা ভাল ক'রে খাও না। তোমাদের পাতে অনেক কিছু প'ড়ে থাকে। উনি যা বলেন সত্যি, বেড়াতে এসেছ, কত ঘুরতে হচ্ছে, ভাল ক'রে না খেলে শরীর থাকবে কেন!

সত্যি বলছি দাদা, আমরা প্রচুর খাই। বৌদি শুধু আমাদের কম খেতেই দেখেন!

সে বললে চলবে না। আজকে এক্ষুণি আসতেই উনি আমাকে তোমাদের খাওয়ার বহরটা একবার দেখিয়ে দিলেন। তোমাদের পাতে সবই তো প'ড়ে থাকতে দেখলাম। মাংস আধবাটি ক'রে প'ড়ে ছিল।

কিন্তু দাদা, মাংসের বাটিগুলো তো দেখতে হবে, প্রায় দু সের ক'রে ধরে যে!

অক্ষয়বাবু বেশ গম্ভীর মানুষ, তবুও বাসুর কথায় না হেসে পারলেন না। সুধীর, বাসুর দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বাসুকে জব্দে ফেলবার আশায়

বললে, তোমার তো তা হ'লে একবার নিজে গিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, বাসু।

অক্ষয়বাবুও সায় দিয়ে বললেন, এ তো বেশ ভাল কথা।

সুধীরের দিকে একবার চেয়ে বাসু নির্বিকার চিত্তে উত্তর করলে, আর বলেন কেন দাদা, রোজ বৌদির সঙ্গে দেখা করব ব'লে নীচে যাই। একটু এধার ওধার ক'রে ফিরে আসি। ভয় হয় দাদা, পাছে ওঁর অসুস্থতার ওপর চাপ দিয়ে ফেলি। একেই তো উনি অসুস্থ শরীর নিয়ে আমাদের জন্তে কী না করছেন! তার ওপর গিয়ে যদি আবার বিরক্ত করি, উনি হয়তো কেন, নিশ্চয়ই অম্লান বদনে সব সহ্য করবেন, সহনশীলতায় সব ঢেকে দেবেন, কিন্তু যে অপকার ক'রে ফেলব, সে অপকার হয়তো অপকারই থেকে যাবে। তাই ভরসা পাই না দাদা, সত্যি ভরসা পাই না।

বাসুর বাক্যবিন্যাসের জলুসে সুধীরের ধাঁধা লেগে গেল। বাসুর কথা অক্ষয়বাবুর তন্ময়তা এনে দিলে। তিনি বাসুর দরদ দেখে শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। অক্ষয়বাবুর কিছুক্ষণের জন্ম বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। বাণ যথাস্থানে পৌঁছেছে বুঝে বাসু জিজ্ঞাসা করলে, বৌদি এখন কেমন আছেন দাদা?

এখন তো ভালই আছেন, তোমরা আসার পর থেকে আর কোন গণ্ডগোল হয় নি।

আমি কিন্তু অনিলকে দিল্লি যাবার সময় বলেছিলাম, আমাদের তাগাদার ঠ্যালায় বৌদি কি রকম চাঙ্গা হ'য়ে ওঠেন, দেখিস না একবার! হার্টের ব্যায়রাম পালাতে পথ পাবে না।

বাসু হাসতে লাগল। অক্ষয়বাবুও হাসতে লাগলেন। বাসু জিজ্ঞাসা করলে, অনিলের আজ কোন খবর পেলেন দাদা?

পেয়েছি। তার ক'রে খবর পাঠিয়েছে, তার আসতে আরো দু তিন দিন

দেরি হবে। বন্ধু নেই, তোমাদের ভারি অসুবিধে হচ্ছে, না?

বাসু চোখে মুখে বিস্ময় টেনে এনে বললে, ও কথা বলবেন না দাদা! আপনি, বৌদি থাকতে কষ্ট! আমি ভাবছি আমাদের সঙ্গে বুঝি অনিলের এবারে আর দেখা হ'ল না।

কেন, কেন?

সুধীরের একটু তাড়া আছে, স্কুল খোলবার আগেই ছেলেদের পরীক্ষার খাতাগুলো ওকে দেখে নিতে হবে।

না না না, তা কখনও হয়! আগ্রায় এলে, সব ভাল ক'রে দেখে শুনে নাও!

সে কাল্লুকে নিয়ে আমাদের সব দেখা হ'য়ে গেছে। আর ফতেপুর সিক্‌রিতে এমন কি দেখবার আছে, কি বলেন দাদা?

ফতেপুর সিক্‌রি! ওটাই তো একটা মস্ত ইতিহাস! আগ্রায় এসে ওটা না দেখে যাওয়া, কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

কিন্তু আমাদের তো সময় হবে না দাদা। পরশুদিন আমরা বৃন্দাবন রওনা হব ভাবছি, তারপর একবার দিল্লি যেতে হবে।

সে তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি বাবুলালকে এক্ষুনি ডেকে পাঠাচ্ছি, ওর মোটরে কালকেই তোমাদের বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। ফতেপুর সিক্‌রিটা একবার দেখে এস, একটা কবর আছে, সত্যিই দেখবার জিনিস!

তারপর তিনি ওঠে প'ড়ে বললেন, তোমরা এখন তা হ'লে বিশ্রাম কর। আমি যাই, বাবুলালকে ডেকে পাঠাই।

বাসু অক্ষয়বাবুর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল। অক্ষয়বাবু বাইরে পা দিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তোমরা দিল্লিতে কবে নাগাদ পৌঁছুতে পারবে ব'লে মনে হয়?

বাসুর এ প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝতে মোটেই কষ্ট হ'ল না। সে কিন্তু ইচ্ছে

ক'রে অবুঝের মত বললে, কেন দাদা ?

আমি ভাবছি, অনিলকে চিঠি লিখে দিই, ও ওখানেই থাকুক। এখানে তো তোমাদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে পেলে না, ওখানে তোমাদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে'খন।

আবার দাদা ওখানে গিয়েও আপনাদের বিরক্ত করব !

এতে বিরক্ত হবার কিছু নেই। আমার ওখানে ব্যবসার জন্যে সব বন্দোবস্ত ক'রে রাখতে হয়েছে, প্রায়ই অনিলকে যেতে হয়, ওখানে আমার লোকও থাকে, তোমাদের খাওয়া দাওয়ার কোন কিছুরই অসুবিধে হবে না।

আমি অসুবিধের কথা ভাবছি না, দাদা। আমি ভাবছি, আপনাদের ওপর কি বড্ড জুলুম ক'রে ফেলব না ! তার ওপর আপনি একলা লোক, অনিল ওখানে মিছামিছি কেন আটকে থাকবে !

এক রকম বাধা দিয়ে অক্ষয়বাবু বললেন, ও আমি চালিয়ে নিতে পারব। তা হ'লে ওই বন্দোবস্তই রইল। আমি লিখে দি, তোমরা দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যেই পৌঁছুবে। তোমরা আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়, কালকে সকালেই আবার ফতেপুর সিক্‌রি যেতে হবে। যাও শুয়ে পড়।

অক্ষয়বাবু চ'লে গেলেন। বাসু নীচে পর্যন্ত অক্ষয়বাবুকে এগিয়ে দিয়ে এল। তারপর ওপরে এসেই সুধীরকে জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগল, আমার জীবনের এই চরম সাফল্যে, তোকে নিয়ে একবার নাচতে ইচ্ছে করছে সুধীর ! এরকমটি আর কখনও ঘটে নি !

ছাড়্, লাগছে।

বাসু সুধীরকে ছেড়ে দিয়ে হেসে বললে, কি রে, বড্ড যে বৌদির সঙ্গে দেখার বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিলি ! হ'ল তো, দিলাম তো কুপোকাত ক'রে !

বাসু এই ব'লে সুধীরের পিঠে এক চাপড় মেরে হেসে উঠল। হাসি প্রশমিত হ'তে না হ'তেই, কিসের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখে, রামচরণ আসছে।

রামচরণের সঙ্গে তার চোখাচোখি হ'তে সে ব'লে উঠল, বাবু, মা আপনাকে একবার ডাকছেন।

আমাকে!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যা, আমি যাচ্ছি।

রামচরণ চ'লে যেতেই, সুধীর বাসুর দিকে চেয়ে হোহো ক'রে হেসে উঠল। বাসু সুধীরের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে নীচে নামতে লাগল। নামতে নামতে, তার রামচরণের উপর রাগ হ'ল। সে ভাবতে লাগল, কেন ব্যাটা ডাকতে এল! এমনি ঘুরে গিয়ে তো বলতে পারত, বাবুরা সব শুয়ে পড়েছেন। ব্যাটা আমার ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! তারপর সে ভাবতে লাগল, ওরই বা দোষ কি! ও তো মনিবের হুকুম তামিল করেছে। কিন্তু অক্ষয়বাবু! উনি এই রাত্রে সব কথা স্ত্রীকে না বললেই তো পারতেন! সাধে ব'লে স্ত্রৈণ!

এই রকম ভাবতে ভাবতে, ভেতরের দরজার চৌকাটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, বাসু চমকে উঠল। তার বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। সে মনে মনে বলতে লাগল, বৌদিকে ভয়টা কিসের!

অক্ষয়বাবু বাসুকে দেখতে পেয়ে বললেন, এস।

বাসু মুখে একটু হাসি টেনে এনে বৌদির ঘরে প্রবেশ করল।

৫

বৌদি তখন দেয়ালে বালিশ রেখে, তাতে ঠ্যাসান দিয়ে, চোখ বুঁজে আড় হ'য়ে শুয়ে ছিলেন। পায়ের শব্দে চোখ খুলে, বাসুকে দেখতে

পেয়ে সস্নেহকণ্ঠে বললেন, এস ভাই।

তারপর তিনি হাত দেখিয়ে সামনের চেয়ারটায় বসবার জন্যে বাসুকে ইঙ্গিত করলেন।

বসতে বসতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কথায় আত্মীয়তা মাখিয়ে বাসু হেসে বললে, অত ব্যস্ত হবেন না বৌদি। যখন এসেছি, রীতিমত ব'সে তবে যাব। দাদার মুখে শুনলাম, আপনি আগেকার চেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। শুনে খুব আনন্দ হ'ল বৌদি!

আমার তো ভাই বিশেষ কোন অসুখই নেই। ওঁরা তো ভেবেই অস্থির। ডাক্তারবাবু বলেছেন, আমার ওঠা একেবারেই চলবে না! কি জানি বাপু! মাঝে মাঝে বুকটা একটু ঢিপঢিপ করে, আর একটু হাঁফ লাগে! এই তো!

এই কয়টি কথা ব'লে বৌদি হাঁফাতে লাগলেন। অক্ষয়বাবু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, না না, তোমার তো বিশেষ কিছুই হয়নি। ডাক্তারবাবু বলেছেন, শরীরটা একটু দুর্বল, দিনকতক ওঠাউঠি বন্ধ করলে শরীরটা একেবারে সুস্থ হ'য়ে যাবে।

এই দেখ না, বাসু এসেছে, ওর বন্ধু এসেছে, আমি কি নিজে হাতে ওদের জন্যে কিছু করতে পারছি! বিদেশে এসেছে, কোথায় একটু আদর যত্ন পাবে, তা নয়!

তারপর বাসুকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বললেন, তুমি নাকি ভাই রোজ আমার সঙ্গে দেখা করতে নীচে আস, পাছে আমার রোগ বেড়ে যায় সেই ভয়ে দেখা কর না?

বাসু কিছু না ব'লে বৌদির দিকে চেয়ে হাসলে। কিন্তু বৌদির চেহারা দেখে, তার বুকের ভেতরটা কি রকম করতে লাগল। সে প্রথম যেদিন এসেছিল, সেদিন বৌদির চেহারাটা এর চেয়ে ঢের ভাল দেখাচ্ছিল। চেহারাটায় উজ্জ্বলতা ছিল। আজ চেহারাটা যেন নীলচে ধরণের।

সেদিন কথা বলবার পর তাঁকে সে এত হাঁফাতে দেখেনি। সে সাহস দেবার জন্যে ব'লে উঠল, না বৌদি, ঠিক তা নয়। ও সব কথা এখন থাক। আমার তো বৌদি, আপনার চেহারা দেখে আপনাকে অনেকটা সুস্থ ব'লেই মনে হচ্ছে!

তারপর অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে সে বললে, আচ্ছা বৌদি, দাদা বলছিলেন, আমরা যা খাই তাতে নাকি আপনার মনঃপূত হয় না!

তোমরা তো কিছুই খাও না ভাই! পাঁড়েজী ওই তো সব অল্প ক'রে নিয়ে যায়! তাও দেখি অর্ধেকের ওপর প'ড়ে থাকে! এত বেড়াতে হচ্ছে, এর ওপর যদি কম ক'রে খাও, আত্মা যে কষ্ট পাবে ভাই! আত্মাই তো মহাপ্রাণী, আর মহাপ্রাণীই তো নারায়ণ! নারায়ণকে কষ্ট দিতে আছে!

বৌদি এবার বেশ হাঁফাতে লাগলেন। বাসু অক্ষয়বাবুর দিকে চাইলে। অক্ষয়বাবু তখন একদৃষ্টে স্ত্রীর দিকে চেয়েছিলেন আর কি যেন বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। বাসু স্বামীস্ত্রীর এই অবস্থা দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, সে বেশ হেসে বললে, এবার থেকে এক কাজ করা যাক বৌদি, রাত্রে কখন আসি ঠিক নেই, সকাল বেলায় আপনার সামনে ব'সে চেয়ে চেয়ে খুব খাওয়া যাবে। কি বলেন? কিন্তু আমি আগে থাকতে ব'লে রাখছি বৌদি, খেয়ে যদি উঠতে না পারি, রামচরণকে আর পাঁড়েজীকে কিন্তু ধ'রে তুলতে হবে।

অক্ষয়বাবু, বৌদি দু জনেই বাসুর কথা শুনে হেসে উঠলেন। বাসুও ওই হাসিতে যোগ দিয়ে বৌদির দিকে তাকাতেই তার বুকটা ছ্যাত ক'রে উঠল! বৌদির মুখখানায় কে যেন এক পোঁচ নীল কালি মাখিয়ে দিয়েছে! আর হাঁফানির তো কথাই নেই! তার ভয় হ'ল, সে তাড়াতাড়ি উঠে আসতে পারলে যেন বাঁচে!

বাসু ব'লে উঠল, তা হ'লে ওই কথাই রইল বৌদি। আমি এখন উঠি, আপনাদের ভয়ানক রাত হ'য়ে যাচ্ছে।

আমি পাঁড়েজীকে ব'লে দিয়েছি, ও কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে বেশি ক'রে খাবার তৈরি ক'রে দেবে। নিয়ে যাবে, লজ্জা ক'রো না। সেখানে ঠিক সময়ে খাবে। শেষকালে পিত্তি প'ড়ে অসুখ না করে!

বাসু আর কথা বাড়াতে সাহস করলে না, সম্মত হ'ল। এ রকম একটা সুবিধায় আজ আর, তার কিন্তু তেমন আনন্দ হ'ল না! যেতে যেতে সে ভাবলে, অক্ষয়বাবুকে একবার বলা দরকার, আজই ডাক্তার ডেকে এনে একবার দেখানো উচিত। এই রকম হাঁফ আর নীলচে চেহারা কিন্তু মোটেই ভাল নয়। তারপর সে ভাবলে, উনি কি আর বুঝেন না, বরাবর দেখছেন। এই রকমই হয়তো হয়, আবার কিছুক্ষণ পরে ঠিক হ'য়ে যায়। দরকার কি বাবা, আমার এত ভাববার! তারপর ডাক্তার আসুক, বলুক বড্ড বাড়াবাড়ি, আর আমাদের যাওয়া ফেঁসে যাক আর কি! ও কিছু নয়, বেরিবেরির হার্ট খারাপে ওই রকম হ'য়েই থাকে।

বাসু চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে, ফতেপুর যাবার কথাটা মনে মনে পাড়লে। সে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। এই রকম নিখরচায় বেড়ানো, তার বেড়ানোর ইতিহাসে এই প্রথম। হঠাৎ তার বাঁধানো নোটবুকটার কথা মনে প'ড়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি ওপরের ঘরে গিয়ে সুটকেসটা খুলে নোটবুকটা ঠিক আছে কি না যাচাই ক'রে দেখলে। নোটবুকটা দেখতে পেয়ে, সেটা আরো ভালভাবে রেখে, সে ভাবলে, আমি হারিয়ে যাই দুঃখ নেই বাবা, কিন্তু এটা হারালে চলবে না, এটা আমার সর্বস্ব, আমার বেড়ানোর গীতা।

৬

ফেরবার পথে মোটরের কল বেগড়ানোর ফলে, বাসুদের ফিরে আসতে বিশেষ বিলম্ব ঘটল। কোথায় দুটো তিনটের মধ্যে ফেরবার কথা, আর কোথায় ফিরল রাত আটটায়। বাড়ি ফিরে সুধীর সোজা ওপরে উঠে গেল। বাসু একবার বৈঠকখানায় উঁকি মারলে, ঘরটা অন্ধকার দেখে সেও উপরে চ'লে গেল।

সুধীর কাপড় জামা ছেড়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসল। বাসু জুতো পর্যন্ত না খুলেই বিছানার ওপর চোখ বুঁজে পা ঝুলিয়ে শুয়ে পড়ল। বাসুর পক্ষে ব'সে থাকার কল্পনা পর্যন্ত অসহ্য বোধ হ'তে লাগল। একে পাঁচ ছ ঘণ্টা অনর্থক ধকল, তার ওপর খিদেয় পেটে তার খিল ধরছিল।

কিন্তু এরকম চুপ ক'রে শুয়ে থাকাও অসম্ভব। ক্ষুন্নিবৃত্তির একটা উপায় করতে হবে মনস্থ ক'রে সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে, পাঁড়েজী আসছে। পাঁড়েজীকে খালি হাতে আসতে দেখে সে মনে মনে চ'টে উঠে বললে, কি চাই ?

পাঁড়েজী খাবার আনবে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে, তাকে আনতে ব'লে ঘরে ঢুকে বাসু, সুধীরকে বললে, এই সুধীর, ওঠ্, পাঁড়েজী খাবার আনতে গেছে।

বাসুর খিদের ঠেলায় ওদের আজ স্নান করা হ'ল না। হাত মুখ ধুয়েই সন্তুষ্ট হ'তে হ'ল। ঘরে ঢুকে বাসু বললে, কি খিদেই পেয়েছে! আজ বৌদিকে তাক লাগিয়ে দেবো।

ওঁর চোখ যদি থাকত, তোর কাণ্ডকারখানা দেখে প্রথম দিনই ওঁর তাক লেগে যেত।

বাসু হাসলে। ইতিমধ্যে খাবার এসে পড়ল। আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নিবিষ্টমনে বাসু খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বেশ খানিকটা

খাওয়ার পর, সে সুধীরকে বললে, এই নিয়ে তিন বার পাঁড়েকে ভেতরে পাঠালাম। আজকে আমাদের খাওয়ার বহর দেখে বৌদির মুখে আর কথাটি থাকবে না, চক্ষুস্থির হ[illegible] যাবে।

হুঁ।

আরো কিছুক্ষণ পরে খাওয়া শেষ হ'ল। রামচরণ এসে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেল। বিছানায় তৃপ্তির সঙ্গে একটু গড়িয়ে নেবার পর বাসু, সুধীরকে বললে, আজকে আর অক্ষয়বাবুর কাছে গিয়ে কাজ নেই। শুয়ে পড়া যাক। কি বলিস?

বেশ তো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বাসু তড়াক ক'রে বিছানায় উঠে বসল। সুধীর জিজ্ঞাসা করলে, কি রে, উঠে বসলি যে!

বড় ভুল হ'য়ে যাচ্ছিল রে! দিল্লির সিমেন্টটা এখনও কাঁচা রয়েছে, অক্ষয়বাবু কি বন্দোবস্ত করলেন জানি না, যাই চট চাপা দিয়ে আসি। নইলে কেউ হয়তো মাড়িয়ে ফেলবে। তুইও চল্ সুধীর। কাল সকালেই তো বেরিয়ে পড়তে হবে। একবার অক্ষয়বাবুর সঙ্গে দেখা করবি চল্, না হ'লে আর সময় হবে না। ভদ্রতার দিক দিয়ে তোর তো আজ একবার দেখা করা দরকার।

আমি কাল যাবার আগে দেখা করব।

আমি তোকে কথা দিচ্ছি সুধীর, তুই থাকতে আমি দিল্লির কথা পাড়ব না। তুই আমায় বিশ্বাস কর।

দু জনে নীচে নেমে গেল। বৈঠকখানায় তখন আলো জ্বলছিল। বাসু সুধীর বৈঠকখানায় ঢুকল। অক্ষয়বাবু ব'সে আছেন। তাঁর পাশে বছর দশেকের একটি ছেলে কাছ ঘেঁষে ব'সে আছে। অক্ষয়বাবু ছেলেটির পিঠে হাত বুলচ্ছেন। সামনে আরো দু জন লোক ব'সে। অক্ষয়বাবুর চোখ দুটি বেশ লাল। বাসু সুধীর চেয়ারে গিয়ে বসল।

অক্ষয়বাবু তাদের আসা বুঝতে পারলেন না। বাসু এটা বুঝতে পেরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে চেয়ারখানা ইচ্ছে ক'রে টেনে বসল। অক্ষয়বাবু চেয়ে দেখলেন, তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের খাওয়া হ'য়ে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেই সময় একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে অক্ষয়বাবুর কাছে এসে বসলেন। অক্ষয়বাবু তাঁর লাল চোখ দুটি ভদ্রলোকটির ওপর মেলে ধ'রে রইলেন। ভদ্রলোক প্রথমে যেন একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। তারপর সে ভাব কাটিয়ে নিয়ে বললেন, বাড়ি এসে সব শুনলাম। তোমাকে এখানে পাওয়া যাবে না ভেবে, ওখানেই গিয়েছিলাম।

অক্ষয়বাবু নিরুত্তর রইলেন। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, বিমল দেখলাম কাতর হ'য়ে পড়েছে। ছেলেমানুষ, মামার বাড়ি থেকে এসেই দেখে এই!

বাসুর বুকটা ছ্যাঁত ক'রে উঠল। সুধীর ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছিল না, তাই সে কান খাড়া ক'রে বোঝবার চেষ্টা করছিল। ভদ্রলোকটির কথা শুনে অক্ষয়বাবু মুখ নত করলেন। তাঁর বুক ঘন ঘন স্ফীত হ'তে লাগল। তিনি ছেলেটির পিঠে ঘন ঘন হাত বুলতে লাগলেন।

ভদ্রলোকটি বললেন, চেষ্টার তো ত্রুটি করনি ভাই, ওদের বরাত, তুমি আর কি করবে বল!

অক্ষয়বাবু তবুও মাথা নত ক'রে রইলেন। ভদ্রলোকটি বললেন, না অক্ষয়, তোমাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, মনে জোর আনতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, অত হার্ট খারাপ নিয়ে লোকে বাঁচে না। উনি যে এতদিন কি ক'রে বেঁচে ছিলেন সেই আশ্চর্য!

বাসু সুধীরের বুঝতে আর বাকি রইল না। তারা কাঠ পাকিয়ে ব'সে

রইল। ভদ্রলোকটি অক্ষয়বাবুর উত্তরের আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। তারপর অক্ষয়বাবু, বাসু সুধীরের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা আর ব'সে থেকো না, শুয়ে পড় গে। বড় ক্লান্ত হ'য়ে এসেছ।

অক্ষয়বাবুর কথাগুলো সুধীরের কানে পৌঁছল কিনা বুঝতে পারা গেল না। সে নিশ্চল, নিস্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। বাসু চেয়ারে ব'সে উসখুস করতে লাগল। তার বুকের ভেতরটা হুহু ক'রে উঠল। তার কান্না আসতে লাগল। সেই সময় ভদ্রলোকটি অক্ষয়বাবুকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, এখানে আসবার সময় পথে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। দুঃখ করতে লাগলেন। বললেন, 'এমন পাজী রোগ ধরেছিল, তেমন কিছু করবার অবশ্য উপায় ছিল না, তবুও আমার মনে হয় যখন শ্বাস কষ্ট বেশি আরম্ভ হয়েছিল, সেই সময় যদি খবরটা পাওয়া যেত, এ যাত্রায় নিশ্চয়ই উনি রক্ষা পেতেন। দুপুরবেলায় গিয়ে দেখি প্রায় সব শেষ হ'য়ে গেছে।'

এই কথা শুনে অক্ষয়বাবু সবিশেষ চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। তিনি বললেন, আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি, মন্মথ। কাল রাত্রে এসে যেন মনে হ'ল কথা বলার সময় সামান্য হাঁফাচ্ছিল। কিন্তু বেশি তো—

হঠাৎ অক্ষয়বাবু বাসুর দিকে চেয়ে সকাতরে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি তো কাল রাত্রে খানিকক্ষণ ছিলে, তুমি কিছু বুঝতে পেরেছিলে?

বাসু চমকে উঠল। সে ভীত হ'য়ে পড়ল। হঠাৎ তার গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। তার মুখ দিয়ে কষ্টের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, আমি, কই না, বু—ঝ—তে, না!

বাসুর উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। তার শরীর ভয়ানক ঝিমঝিম করতে লাগল, মাথা রীতিমত ঘুরতে লাগল। সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। তার ভেতর থেকে

ব'লে উঠল, তুমি বুঝতে পেরেছিলে, স্বার্থের জন্যে বলনি।

বাসু তার দুটো হাত দিয়ে মুখখানা ঢেকে মনে মনে প্রতিবাদ ক'রে ব'লে উঠল, আমি সত্যি বুঝতে পারিনি!

আবার ভেতর থেকে বললে, তুমি বুঝতে পেরেছিলে, নিশ্চয়ই পেরেছিলে। এখন ঢাকলে চলবে কেন!

বাসু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে পাগলের মত চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল, না, না, আমি বুঝতে পারিনি বলছি!

ঘরের সকলে চমকে উঠল। অক্ষয়বাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

বাসু কোন উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। অক্ষয়বাবু বললেন, ঘুরে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ, বিশ্রাম কর গে।

বাসু আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কোন রকমে টলতে টলতে ওপরে গিয়ে সে বিছানার ওপর ধপাস ক'রে ব'সে পড়ল।

মিনিট পাঁচেক পরে, সুধীর ওপরে উঠে দূর থেকে ঘরটায় ধোঁয়ায় ধোঁয়া দেখতে পেলে। তার নাকে কাগজ পোড়া গন্ধ আসতে লাগল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখে, আলোর চিমনিটা টেবিলের এক পাশে প'ড়ে, আর বাসু আলোর কাছে দাঁড়িয়ে কি একটা থেকে একখানা ক'রে ছোট কাগজ ছিঁড়ছে আর আলোর মুখে ধ'রে পোড়াচ্ছে। আলোটা মাঝে মাঝে দাউ দাউ করে জ্ব'লে উঠছে। সেই দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠার মাঝে সুধীর ভাল ক'রে দেখলে, যেটা থেকে সে কাগজ ছিঁড়ছে, সেটা তার বাঁধানো ছোট নোটবুক, তার বেড়ানোর গীতা।

নগিন মাস্টার

১

সবাই ব'লত, হ্যাঁ, নগিন মাস্টারের চেহারা বটে! যেমনি হাতের গুলো, তেমনি পায়ের ডিম! উরুত যেন ভীমের গদা! আর কোমর কি সরু! ছাতি নয় তো যেন বাঘের ছাতি!

এমন কি স্কুলের দুঁদে ছেলেরা পর্যন্ত মাস্টারকে দেখলে, দুষ্টুমি ভুলে গিয়ে তার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আর মাস্টার পিছন ফিরলেই তার চেহারার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রত।

সত্যি, নগিন মাস্টার শরীরের খুব যত্ন নেয়। প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়াম করে, খুব ঘ'ষে ঘ'ষে বহুক্ষণ ধ'রে তেল মাখে, ছোলা, বাদাম, পেস্তা খায়। এ সব ব্যাপারে তার আলস্য কল্পনাতীত।

সেদিন মাস্টারের অলক্ষ্যে তার স্ত্রী দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাস্টারের তেল মাখা দেখছিল। মাস্টার তেল মাখা শেষ ক'রে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে, স্ত্রী হনহন করতে করতে মাস্টারের একেবারে সামনে এসে ঝাঁজের সঙ্গে ব'লে উঠল, একি অনাসৃষ্টি ব্যাপার! মাথাটা কি শরীর থেকে বাইরে!

মাস্টার ন'ড়ে উঠে বললে, অ্যাঁ!

সমস্ত শরীরের যত্ন নিতে পার, আর চুলের যত্ন নিতে পার না!

মাস্টার নীরব হ'য়ে প'ড়ল। স্ত্রী ঝাঁজের সঙ্গেই বলতে লাগল, বলি

মাথাটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ! মাথাটার যে কী হাল হচ্ছে সে হুঁশ আছে! মাথার তেলো তো প্রায় তেলা হ'য়ে এল, আর এধারে কপালের দুধার থেকে দুটো সুরঙ্গ মাথার ওপরে উঠে সামনের মাথাটা যে একাকার ক'রে দেবার চেষ্টায় আছে, সে দিকে খেয়াল আছে?

মাস্টার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিলে।

স্ত্রী ব'লে যেতে লাগল, কতদিন বলেছি, ওগো, একটু ঘ'ষে ঘ'ষে মাথায় তেল মাখ, না কে কার কথা শোনে! এদিকে শরীরে দু তিন বার ক'রে তেল মাখবার তুমি সময় পাও, আর যত তোমার সময়ের অভাব ওই মাথার বেলায়!

মাস্টার একটা কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছিল, স্ত্রী বাধা দিয়ে ব'লে উঠল, চুপ কর, আমায় বলতে দাও, আমি মুখ বুঁজে বহুদিন সব সহ্য ক'রে এসেছি, কিন্তু আজ আর সহ্য করব না। তখন সবে চুল উঠতে শুরু করেছে, দোষের মধ্যে আমি একদিন কত সমীহের সঙ্গে বলেছিলাম, তুমি এই তেলটা মাখ, তুমি কিনা একেবারে তেলে বেগুনে জ্ব'লে উঠে আমায় বললে, 'আমি ওসব পারব না! বাবুগিরি আমার ধাতে সইবে না, বরং ওই পয়সায় ছোলা, বাদাম, পেস্তা খেলে শরীরের উপকার হবে!'

বক্তব্য পেশ করতে বাধা পাওয়ায়, নগিন মাস্টারের মনটা শক্ত হ'য়ে উঠেছিল, সে এবার ব'লে উঠল, সত্যিই তো, গাছের মাথায় পাতা না থাকলেও গাছ বাঁচে।

বাঁচে! এদিকে তো মাথার দিকে আর চাওয়া যায় না।

না, চাওয়া যায় না, তোমার সব বাড়াবাড়ি।

মাস্টার নিজের অজ্ঞাতে কিন্তু আর একবার মাথায় হাত বুলিয়ে নিলে।

স্ত্রী এবার বেশ তেতে ব'লে উঠল, বাড়াবাড়ি! কখনো আরশির দিকে ভাল ক'রে তাকাও যে বুঝতে পারবে মাথার অবস্থা ক্রমশ কোথায়

গিয়ে দাঁড়াচ্ছে! এই তো দাদা চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ফিরে এলেন, এখনো দেখ এক মাথা চুল! সেদিন—

স্ত্রীর গলা ধ'রে এল। সে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ধরা গলায় বললে, সেদিন দাদা আর তুমি পাশাপাশি ব'সে আছ, কথা কইছ, আমি দূর থেকে দেখলাম, দাদাকে তোমার চেয়ে ছোট দেখাচ্ছে! কেন দেখাবে শুনি? তুমি দাদার চেয়ে বয়সে বড়, না তোমার স্বাস্থ্য খারাপ?

মাস্টার সান্ত্বনা দিয়ে বললে, তুমি বুঝছ না!

আমি বুঝব কেন, যত বোধশক্তি তোমারই আছে। হাঁদার কেন চাকরি গেল জান?

হাঁদার!

হ্যাঁ হ্যাঁ, হাঁদার! তুমিই তো বল, ওর মত ভাল ছেলে সচরাচর চোখে পড়ে না, এম, এস্‌সিতে কী ফলটাই না দেখিয়েছে! কিন্তু এত ভাল ছেলে হ'য়ে কি হ'ল শুনি? বাইশ বছরের মধ্যে একমাথা টাক নিয়ে ঘুরঘুর ঘুরঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে! যা-ও একটা সাহেবী অফিসে কেমিস্টএর চাকরি পেলে, তা-ও রাখতে পারলে না!

কেন, কেন?

ওদের অফিসের বড় সাহেব ছুটিতে বিলেতে গিয়েছিল, ফিরে এসে হাঁদাকে দেখে হেড কেমিস্টকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওকে নেওয়া হয়েছে কেন? জান, আমার অফিসে নবীন যুবক ছাড়া আমি কাউকে নিয়োগ করি না?

হেড কেমিস্ট ব'লে উঠল, ও একজন যুবক স্যার, আর খুব শিক্ষিত। সাহেব তো শুনে স্তম্ভিত। হাঁদাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বয়স কত?

বাইশ।

কত বললে !

বাইশ।

বাইশ ! হ'তেই পারে না, নিশ্চয়ই কোথায় কেউ একটা ভুল ক'রে ফেলেছে। যাই হোক বাবু, আমি খুবই দুঃখিত, আমি তোমায় রাখতে পারলাম না। তুমি আমায় মার্জনা কর। আমি কোনমতেই নবীন যুবক ছাড়া কাউকে নিয়োগ করতে পারি না।'

মাস্টার এবার হেসে ফেলে বললে, তুমি কী যে বল মমতা তার ঠিক নেই ! জান, সারা বিলেতটা টাকে ভরা ?

তা হ'তে পারে কিন্তু ওরা টাকা খরচ ক'রে টাক পুষতে যাবে কেন আমায় বলতে পার ?

মাস্টার হাসতে লাগল। মমতা ব'লে উঠল, তুমি হাসছ ! কিন্তু হাঁদা নিজে আমায় এসব কথা বলেছে।

না না, তুমি কী যে বল !

এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

মাস্টার অন্তরে দমে গেল কিন্তু প্রকাশ্যে অটুট রইল।

২

এই রকম নরমে গরমে দিন কাটে। এমনও হয়, উপলক্ষের অভাবে নরমেই কাটে। বেশ হাসিখুশির মধ্যে দিয়েই দিনগুলো যায়।

সেদিন শনিবার। মমতা চারটের মধ্যেই তার পিসিমার বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখে, মাস্টার ঘরে ব'সে একমনে একখানা বই পড়ছে। মমতা এগিয়ে আসতে মাস্টার বইখানি নামিয়ে রেখে, পাশের জায়গাটি দেখিয়ে হাসিমুখে ব'লে উঠল, এস, বস।

খুব হয়েছে, আর ইয়েতে কাজ নেই।

মাস্টার খপ ক'রে মমতার একখানি হাত ধ'রে ফেলে ব'লে উঠল, না

না, ইয়ে নয়, সত্যি কতক্ষণ তোমাকে দেখিনি বল তো, আমার প্রাণে বুঝি শথ যায় না।

ইশ, খুব যে!

মমতা ব'সে প'ড়ে মাস্টারের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, জান, আজকে পিসিমার ওখানে ভারি একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল!

না বললে কি ক'রে জানব বল, পিসিমা তো তাঁর ভাইঝিটিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পেটপুরে খাওয়ালেন।

আমার কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল, দাদার সামনে, ছি!

মাস্টার কৌতূহল পরবশ হ'য়ে, স্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কী, ব্যাপারথানা কি?

মমতা মুখ টিপে হেসে উত্তর করলে, সে আমি তোমাকে বলতে পারব না।

আমাকে তা হ'লে পর ভাবো।

বল, ঠাট্টা করবে না?

আরে, ঠাট্টা করতে যাব কেন!

ঠিক।

হ্যাঁ, ঠিক।

মমতা হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ব'লে ফেললে, পিসিমা দাদাকে বলছিল, 'মমের তো আট বছর বিয়ে হ'ল, আর তো একটা ছেলে না হ'লে মানাচ্ছে না।'

মাস্টার হোহো ক'রে হেসে উঠে বললে, দাদা কি বললেন?

তোমার সব তাতেই ঠাট্টা!

না না ঠাট্টা নয়, আমার শুনতে ভারি ভাল লাগছে।

মমতা কপট রাগভাব দেখিয়ে বললে, দাদা কি আর বলবে, হুঁ ব'লে সেখান থেকে চ'লে গেল। পিসিমার যেমন কাণ্ড!

মাস্টার কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে ব'লে উঠল, না মমতা, পিসিমা তো ঠিক কথাই বলেছেন।

মমতা মাস্টারের কপটতা বুঝতে না পেরে ব'লে উঠল, পিসিমা কেন ডেকে পাঠিয়েছিল, জান? সুষমাও এসেছিল কিনা, আমাদের দু জনকে দুটো মাদুলি পরিয়ে দিলেন।

মাস্টার হাসি চেপে গম্ভীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিসের মাদুলি মমতা? তারপর হাসি আর চাপতে না পেরে সে খুব জোরে হেসে উঠল। মমতা তড়াক ক'রে স'রে গিয়ে ব'লে উঠল, আমি জানি না, যাও!

আচ্ছা মমতা, আমার একটা কথার জবাব দেবে?

আমি কোন কথার জবাব দেবো না, আমায় শুধু ঠকাবার মতলব!

তুমি কলেজে পড়েছ তো, মাদুলিতে বিশ্বাস কর?

কলেজে পড়েছি তো হয়েছে কি?

ও তাও তো বটে।

মমতা উঠে প'ড়ে বললে, আমি তা হ'লে এখন চললুম।

দোরের কাছ বরাবর গিয়ে, সে ফিরে আসতে আসতে বললে, হ্যাঁ দেখ, আমি সুষমাকে রবিবার এখানে খাবার কথা ব'লে এসেছি। তুমি সুবিধামত নরেনবাবুকে গিয়ে ব'লে এস।

যো হুকুম মহারাণী।

রবিবার কোথাও আটকা পড়লে চলবে না কিন্তু, তা আমি তোমায় আগে থাকতেই ব'লে রাখছি।

কোথায় আর আটকা পড়ব বল? তোমার কাছেই যে আমার আটকে বাঁধা।

তাই নাকি!

মাস্টার মাথাটা নীচু ক'রে ব'লে উঠল, হ্যাঁ মমতা।

মমতা খুশী মন নিয়ে চ'লে গেল।

৩

রবিবার এল। অন্যান্য দিন মাস্টার সকাল ছটার সময় ব্যায়াম শুরু ক'রে সাতটায় শেষ করে। ঝাড়া এক ঘণ্টা কসরত করবার পর, তার আর এক ঘণ্টা লাগে, পায়চারি ক'রে ক'রে রক্তের টগবগানি থামাতে আর ছোলা, বাদাম, পেস্তা খেতে। আজকে কিন্তু তাকে ভোর পাঁচটায় ব্যায়াম আরম্ভ করতে হয়েছিল, তার অবশ্য একটা কারণও ছিল। গতরাত্রে শোবার সময় মমতা মিনতি ক'রে বলেছিল, লক্ষ্মীটি, কাল ব্যায়ামপর্ব একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে প্রথম মহড়ায় ভাল মাংস কিমা ক'রে এনো, আমি কোপ্তা করব। কোপ্তা না পেলে নরেনবাবু ফিরে যাবেন ব'লে শাসিয়েছেন।

মাস্টার সোৎসাহে উত্তর করেছিল, আমারও কিন্তু তোমার হাতের কোপ্তা খুব ভাল লাগে মমতা, আর কোপ্তা কেন, তুমি যা রাঁধ তাই আমার মুখে লেগে থাকে, অমৃত লাগে, তুমি স্বর্গচ্যুতা!

বল কি!

হ্যাঁ মমতা।

তা হ'লে আমায় কথা দিলে?

কথা কেন মম, গর্দান দিতে পারি।

আমি পুরো মাস্টার মশাইকে চাই, তার গর্দান নিয়ে কি করব?

মাস্টার সর্বদাই হাজির জানবে।

হাসাহাসির মধ্যে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে মমতা কাপড় কেচে এসে দেখে, মাস্টার পায়চারি করছে, হাতে তার মগ, মগ থেকে মাঝে মাঝে ছোলা, বাদাম, পেস্তা তুলছে আর মুখের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

মমতা ব্যস্ততার সঙ্গে ব'লে উঠল, কই তোমার হ'ল?

মাস্টার চিবতে চিবতে উত্তর করলে, হ্যাঁ, এইবার যাই।

মমতা এগিয়ে আসতে আসতে বললে, মগ তো এখনও ছাড়নি দেখছি! দেখি, কতগুলো আছে?

মমতা দেখে চমকে উঠে ব'লে উঠল, ও বাবা, এখনও যে সবে মগের গলা পর্যন্ত!

না, এই শেষ ক'রে নিচ্ছি।

মাস্টার ঘন ঘন চিবতে লাগল। মমতা ব'লে উঠল, আর তাড়াতাড়ি করতে হবে না, শেষকালে গলায় বেধে একটা ফ্যাসাদ বাঁধুক আর কি! তার চেয়ে এক কাজ কর না, বেড়ানোও হবে আর ধীরে-সুস্থে ছোলা খাওয়াও হবে, ওগুলো পকেটে পুরে বেরিয়ে পড় না?

মাস্টার এবার হেসে ফেলে বললে, তুমি আমায় মর্নিং স্কুলে পাঠাচ্ছ না কি?

৪

কিমা এনে দিয়ে, মাস্টার গায়ে র‍্যাপারখানা জড়িয়ে ছেলেদের পরীক্ষার খাতাগুলো একমনে দেখতে লেগে গেল। খাতা দেখতে দেখতে কতক্ষণ কেটে গেছে মাস্টারের হুঁশ নেই, হঠাৎ সুষমার ডাকে তার চমক ভাঙল। সুষমাকে দেখতে পেয়েই মাস্টার ব'লে উঠল, আরে এস, এস। মাপ করবেন জামাইবাবু, আপনি যে কাজে এত ব্যস্ত, আমি বুঝতে পারিনি।

কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাস্টার ব'লে উঠল, তুমি কি বলতে চাও সুষমা— সে ইচ্ছে ক'রেই থেমে গেল।

বলতে বলতে থেমে গেলেন যে জামাইবাবু!

কিছু না।

কিছু নয় কেন, কি যে বলতে যাচ্ছিলেন?

তুমি কি বলতে চাও দেবী সুষমা, খাতা দেখাই আমার কাজ, আর তুমি

আমার শ্যালিকা হচ্ছ অকাজ!

সুষমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একগাল হেসে ব'লে উঠল, ও তাই বলুন, আমি মনে করলুম কি না কি একটা সাংঘাতিক কথা বলতে চাইছেন!

এ সব কথাই তো সাংঘাতিক ভাই, এ সব যে হচ্ছে খাস প্রাণের কথা।

সুষমা মহাখুশী হ'য়ে ব'লে উঠল, সত্যি জামাইবাবু, আপনি এমন কথা বলেন, আপনার সঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

মাস্টার ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, আরে চুপ চুপ, করছ কি!

সুষমা অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন জামাইবাবু?

এক্ষুণি হয়তো তোমার দিদি শুনে ফেলবে!

সুষমা হেসে বললে, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই, মমতাদি জানে, আমি আপনাকে প্রশংসা ক'রে থাকি!

জানে! বল কি!

হ্যাঁ।

সত্যি তোমরা জটিল, দুর্জ্ঞেয়! তোমাদের নমস্কার।

সুষমা হাসতে লাগল। মাস্টার বললে, তারপর, আমার শালীবাহনটি গেলেন কোথায়?

আর বলেন কেন! বেরিয়েছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে হাজির। উনি আমায় ডেকে চুপি চুপি বললেন, 'একজন মক্কেল এসে পড়েছে, কেন টাকা কটা মারা যায়, তুমি ততক্ষণ অনিলকে নিয়ে এগ'ও আমি চট ক'রে সেরে নিয়ে যাচ্ছি।' হাসলেন যে জামাইবাবু?

দুঃখে।

কার দুঃখে জামাইবাবু?

নরেনের।

টাকার লোভের জন্যে বুঝি?

না ভাই না, টাকা আমিও ভালবাসি।

তবে!

ও তো জানে না, ও কী হারাতে চলেছে!

কি জামাইবাবু?

এই যে সে, তার আয়েষাটিকে জগৎসিংহের কাছে একলা ছেড়ে দিলে, এখন যদি আয়েষা জগৎসিংহকে দেখিয়ে তাকে ব'লে ফেলে, ইনি আমার প্রাণেশ্বর, তখন?

সুষমা খুব হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে সে ব'লে উঠল, কিন্তু জামাইবাবু, আপনার যে ঠিকে ভুল হ'য়ে গেল, এ আয়েষা তো আপনার সে আয়েষা নয়, এ যে জগৎসিংহকে প্রাণেশ্বর বলবার আগেই ওসমানকে বিয়ে ক'রে ফেলেছে!

তা হ'লে বল, তোমার আমার মাঝখানে মাউন্ট এভারেস্ট এসে দাঁড়িয়েছে?

মমতা ঘরে ঢুকে বললে, কি, সুষমার বুঝি ভূগোলের জ্ঞান যাচাই ক'রে নিচ্ছ?

সুষমা হাসতে লাগল। মাস্টার তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, না আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, নরেন ছোলা খায় কি না।

মমতা হেসে বললে, তা নরেনবাবুর ছোলা খাওয়ার সঙ্গে মাউন্ট এভারেস্টের কি সম্পর্ক?

না না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, সুষমা, আমি তোমায় বলছিলাম না, এ জীবনে আমি যত ছোলা খেয়েছি, সেগুলো জড়ো করলে এতদিনে মাউন্ট এভারেস্ট হ'য়ে দাঁড়াত?

উত্তর শুনে সুষমা হাসতে হাসতে বেঁকে গেল। মমতাও খুব হাসতে

লাগল। মাস্টারও আর থাকতে পারলে না, ওদের হাসিতে যোগ দিয়ে ফেললে।

মমতা ও সুষমা হাসতে হাসতে নীচে চ'লে গেল। মাস্টার আবার খাতা দেখায় মন দিলে।

৫

নীচে যেতে যেতে সুষমা বললে, সত্যি মমতাদি, জামাইবাবুর মত এরকম মার্জিতরুচি আর প্রাণখোলা লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

মমতা মৃদু হেসে উত্তর করলে, ওই করছেন আর কি! ছোলা, বাদাম, পেস্তার গল্প শোনাতে পেলে আর কিছু চান না। কোন কথাবার্তার পর ছোলা, বাদাম, পেস্তার কথা দিয়ে, মধুরেণ সমাপয়েৎ করবেনই।

বল কি!

ততক্ষণ দুজনে রান্নাঘরে এসে পড়েছে। মমতা ব'লে উঠল, আর 'বল কি!' সেদিন কি হয়েছিল জানিস?

কি মমতাদি?

আমার মামাতো ননদ মিলি, সেদিন সকালে এসেছিল। উনি তখন সবে ব্যায়াম শেষ ক'রে ছোলায় হাত দিয়েছেন। ভাইবোনে কথাবার্তা শুরু হ'ল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ছোলার পর্ব এল, আমি উঠে এলাম। প্রায় একঘণ্টা হ'য়ে গেল, তখনো দেখি মেয়েটা নামে না! তখনি বুঝলাম, ছোলার প্রথম আবির্ভাব থেকে বর্তমান অবস্থার একটা নির্ঘণ্ট দেওয়া হচ্ছে। ওপরে উঠেই শুনতে পেলাম, উনি বলছেন, 'জান মিলি, লোকে বলে, ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, গড়পড়তা আয় অতি নগণ্য। আমি এ সব কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু শুখিয়ে মরবার এতে কী আছে, অল্প পয়সায় হবে, সকলে ছোলা খাও।' আমি ঘরে ঢুকলাম, দেখি, মেয়েটা কাঠ পাকিয়ে ব'সে ব'সে

শুনছে আর মাঝে মাঝে মগ থেকে ছোলা খাচ্ছে।

বল কি মমতাদি!

হ্যাঁ রে। আমি ওঁকে বললাম, মিলিকে আমি নিয়ে যেতে পারি? ওর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ, যাবে বই কি।' তারপর উনি মিলির দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, 'তোমাকে একটা কথা এখনও আমার বলা হয় নি মিলি, সেটা হচ্ছে ছোলার প্রকারভেদ। যেমন সব মানুষ সমান গুণবিশিষ্ট নয়, তেমনি সব ছোলারও গুণ এক নয়। যেমন ধর কাবলী ছোলা, দি—'

সুষমা এতক্ষণ বেশ শুনছিল, এবারে হাসতে হাসতে রান্নাঘরের মেঝে ব'সে প'ড়ে লুটোপুটি খেতে লাগল। অতিকষ্টে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে সে ব'লে উঠল, সে যাই বল মমতাদি, জামাইবাবু কিন্তু খুব ভাল লোক।

হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে যাওয়াতে, সুষমা হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, আচ্ছা মমতাদি, জামাইবাবুর কি কোন অসুখ-বিসুখ করেছিল?

কেন বল্ তো?

না, আমি তো জামাইবাবুকে অনেকদিন বাদে দেখলাম, এই টাইফয়েড টাইফয়েড থেকে সেরে উঠলে মাথার যেমন অবস্থা হয়, সেইরকম দেখলাম কিনা? মাথার খানিকটা চুল উঠে গেছে, মাথাটা ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাচ্ছে, চুলগুলো পাতলা পাতলা, ফাঁক ফাঁক—

কি বললি!

না তাই বলছিলাম, জামাইবাবুর আর বয়েস কত বল! সত্যি কথা বলতে কি, এবারে ওঁকে একটু বুড়োটে বুড়োটে দেখলাম। জামাইবাবুর নিশ্চয়ই অসুখ-বিসুখ করেছিল, আমাদের তো একটা খবর দিলে পারতে!

মমতার মনে ঝড় বইতে লাগল। সে অতিকষ্টে ব'লে উঠল, না, তেমন কিছু হয় নি।

একথা সেকথার পর, সে সুষমাকে কাজে ব্যস্ত রেখে, ওপরে উঠে সটান ঘরে প্রবেশ করতেই, মাস্টার ব'লে উঠল, সুষমাকে বসিয়ে চ'লে এলে যে ?

মমতা কোন উত্তর না দিয়ে সোজা গিয়ে আলমারি খুলে কি একটা বের করলে। তারপর সে হনহন করতে করতে মাস্টারের সামনে এসে রীতিমত রেগে ব'লে উঠল, ওঠ, ওঠ বলছি !

মাস্টার তো অবাক ! সে আমতা আমতা করতে লাগল। তার মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল, কেন ?

কেন !

মমতার গলা ধ'রে এল। ধরা গলা শুনে মাস্টার রীতিমত ভড়কে গেল। সে মোলায়েম সুরে বললে, ব্যাপার কি মমতা ?

আগুনে যেন ঘি পড়ল। মমতা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উত্তর করলে, ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু ! কতদিন আমি বলেছি, ওগো, সময় থাকতে চুলের যত্ন নাও, নইলে এর পরে কূল কিনারা দেখতে পাওয়া যাবে না, না, কে কার কথা শোনে, আমি যেন বাঁদী না দাসী—

মমতা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। মাস্টার নতমুখে ব'সে রইল। কিছুক্ষণ পরে মমতা, একটা শিশি টেবিলের ওপর রেখে প্রচণ্ড অভিমানের সঙ্গে বললে, এই তেল রইল, যদি ভাল মনে কর মেখো।

মমতা আর দাঁড়াল না, হনহন ক'রে বেরিয়ে যেতে লাগল। মাস্টার কি বলবার জন্যে মুখ উঁচু ক'রে দেখে, মমতা বেরিয়ে গেছে। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা আবার নীচু হ'য়ে পড়ল।

৬

খাওয়ার পর্ব শেষ ক'রে সুষমা নরেন বাড়ি চ'লে গেছে। ওপরে মাস্টার চেয়ারে ব'সে নতমুখে ভেবেই চলেছে। নীচে রান্নাঘরের কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মমতাও আকাশ পাতাল ভাবছে। কিছুক্ষণ পরে মমতা একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ওপরে উঠতে লাগল। ঘরে ঢুকে মাস্টারের দিকে পিছন ফিরে সে বিছানা থেকে বালিশগুলো তুলে নিয়ে সজোরে ঝাড়তে লাগল। উদ্দেশ্য অবশ্য মাস্টারের মনোযোগ আকর্ষণ করা। মমতা ঘরে ঢোকার পর থেকে মাস্টার কিন্তু তার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। অল্পক্ষণ পরে মাস্টার আদর ক'রে ডাকলে, মম।

মমতা কোন সাড়া দিলে না। মাস্টার উঠে এসে মমতার পিঠে একখানি হাত রেখে বললে, মম, তুমি আমায় ভুল বুঝ না! তুমি তো দেখেছ, আজকাল আমি কি রকম চুলের যত্ন নি, তিন চার বার ক'রে চুল আঁচড়াই, তোমার কথামত অনেকক্ষণ ধ'রে কি রকম ঘ'ষে ঘ'ষে তেল মাখি!

মমতা নরম হ'ল না, বরং পিছন ফিরেই বেশ ঝাঁজের সঙ্গে ব'লে উঠল, কিন্তু আমি যে তেলটা আনিয়েছিলাম, সেটা মেখেছিলে?

কেন, আমি তো একদিন মেখেছিলাম কিন্তু কি করব বল, সর্দি যে ঝামরে এল।

মমতা এবার জ্ব'লে উঠে মাস্টারের দিকে ফিরে ব'লে উঠল, সর্দি ঝামরে গেল না হাতি, গন্ধ ব'লে তুমি মাখ নি, ফের তুমি আমায় ঠকাচ্ছ!

মাস্টার অপ্রস্তুতে প'ড়ে গেল। সে আমতা আমতা ক'রে ব'লে উঠল, না না, হ্যাঁ, মানে তা নয়, মানে—

ফের!

মাস্টার নীরব হ'য়ে পড়ল। মমতা অভিমানভরে ব'লে উঠল, আমার

আর কি ! কিন্তু লোকে কেন আমায় বলবে ! আজকে সুষমা আমার মুখের ওপর বললে, 'মমতাদি, জামাইবাবুর কি কোন অসুখ বিসুখ করেছিল ? এই টাইফয়েড টাইফয়েড, মাথাটা ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাচ্ছে: চুলগুলো পাতলা পাতলা, ফাঁক ফাঁক, সত্যি কথা বলতে কি মমতাদি জামাইবাবুকে আজকে বুড়োটে বুড়োটে দেখলাম।' এসব কথা কেন আমায় বলবে শুনি ? আমিও বা শুনতে যাব কেন ?

মাস্টার চমকে উঠে বললে, সুষমা বলেছে !

মমতা ক্ষেপে গিয়ে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ ! আমাকে গলা টিপে মারতে পার !

মমতা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিলে, সে যেন কিছু চাপতে গেল। মাস্টার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চেয়ারে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মাস্টার ধীরে ধীরে মমতার কাছে উঠে এসে বেশ নরম ক'রে বললে, কিন্তু মমতা তুমি কেন এটা বুঝছ না, এর পরিণতি আমাদের সহ্য করা ছাড়া উপায় কি ! ওই তো বাবা, ঠাকুরদা মশাইএর ফটো রয়েছে, ও সব দেখলে আশা কি ক'রে করতে পারি বল ? সেইজন্যে তুমি যখন মাঝে মাঝে বল, আমার মনে হয়, মিথ্যে কেন উৎকণ্ঠায় ভুগি, কতকগুলো টাকা অপব্যয় করি।

মমতা চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, আমি ও সব বিশ্বাস করি না !

কিন্তু ফটোগুলো তো মিথ্যে নয়, ওরা কি সাক্ষ্য দেয় দেখ !

মমতা এবার একরকম ক্ষেপে গিয়ে ব'লে উঠল, ওরা মিথ্যে সাক্ষি দেয় ! তুমি কি বলতে চাও, একটা জমির প'ড়ো নাম হ'য়ে গেছে ব'লে চেষ্টা করলে তাতে ফসল ফলানো যায় না ?

কিন্তু মমতা, জমি আর মাথা কি এক !

হ্যাঁ হ্যাঁ এক, কোন তফাত নেই, এটা হচ্ছে পৃথিবীর মাথা আর ওটা হচ্ছে মানুষের মাথা।

মাস্টারের চোখের সামনে, সুষমা এসে দাঁড়াল, মমতার যুক্তি তার কাছে

যুক্তিপূর্ণ ব'লে মনে হ'ল। সে আশার সুখ অনুভব করতে লাগল। সে খুশী মনে ব'লে উঠল, তুমি ঠিকই বলেছ মম, কিন্তু উপায়টা কি বল?
মমতাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ব'লে উঠল. সত্যি কথা বলতে কি, আমরা তো সেরকম কোন চেষ্টাই করিনি! এই ধর টোটকা টাটকি, এক নাগাড়ে পেঁয়াজ ঘষা বা কোনরকম কবিরাজী তেল নিয়ম ক'রে মাখা।
মমতা মাস্টারের আরো কাছে স'রে এসে উৎসাহভরে বললে, দেখ, সে দিন প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে একটি তেল দেখলাম, সকলে বলাবলি করছিল তেলা টাক পর্যন্ত এ তেলে সারে।
মমতা ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়তে নাড়তে ব'লে উঠল, কিন্তু কি যে স্মরণশক্তি হয়েছে আমার, নামটা তো কিছুতেই মনে পড়ছে না! কি যে নামটা? দু একটা ভাল তেলের নাম কর তো—আঃ, কি যে নামটা— হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে রাম কবিরাজের তেল!
মাস্টার একরকম লাফিয়ে উঠে ব'লে উঠল, ভয় নেই, ভয় নেই মম, পেয়েছি, পেয়েছি!
মমতা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, কি পেয়েছ! অমন করছ কেন?
মাস্টার অনেকটা শান্ত হ'য়ে উত্তর করলে, দরকারের সময় কিছুতেই মনে পড়বে না। আরে, আমার আবার ভাবনা কি, আমার বন্ধু রামময় তো রয়েছে, অত বড় ডাক্তার, বিলেতে বহু গবেষণা ক'রে কেশবিশেষজ্ঞ হ'য়ে ফিরে এসেছে! তুমি তো তাকে চেনো মমতা, তুমিই বা কোন্ ওর কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে?
রামময়বাবু!
হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের রামময়, যে আমাদের বিয়ের তিন বছর পরে বিলেত থেকে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল, তোমার মনে নেই?

মনে আছে বই কি, খুব আছে! আমি জানি উনি ডাক্তার হ'য়ে ফিরে এসেছেন, কিন্তু উনি যে কেশবিশেষজ্ঞ হ'য়ে এসেছেন, একথা তুমি তো আমায় বল নি!

মাস্টার এবার হেসে বললে, বলিনি! তা বলব কেন, এ সব যে কাজের কথা, এ সব তো বলব না!

মাস্টার হাহা ক'রে হেসে উঠল। মমতাও প্রাণখুলে সেই হাসিতে যোগ দিলে। মাস্টার হাসতে হাসতেই ব'লে উঠল, তুমি কিছু ভেবো না মম, আমি কালই গিয়ে এর একটা হিল্লে ক'রে আসব।

কাল সকালে উঠেই কিন্তু যেয়ো, একদিন ব্যায়াম নাই বা হ'ল?

রেখে দাও তোমার ব্যায়াম!

মমতা একগাল হেসে ব'লে উঠল, তুমি সত্যিই আজ আমায় বাঁচালে।

৭

মাস্টার পরদিন সকালে উঠেই তৈরী হ'য়ে নিলে। মাস্টারের পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মমতা ব'লে উঠল, টেবিলের ওপর যে নোট দুখানা রেখেছিলাম, নিয়েছ তো?

অ্যাঁ! না।

একেবারে ওষুধ কিনে নিয়ে আসতে হবে না! আমি তখন তোমাকে কী বললাম! দাঁড়াও আমি আসছি।

মমতা ছুটে ওপরে চ'লে গেল। তখুনি ফিরে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, এই কুড়ি টাকা রাখ, বলা তো যায় না, রামময়বাবু কিরকম দামী ওষুধের ব্যবস্থা দেন, বিলেত ফেরত ডাক্তার!

সে তো বটেই, সে তো বটেই। সত্যি মম, তুমি না থাকলে আমি একদণ্ডও বাঁচবনা।

একটু সাবধান হ'য়ে যাবে, আর দেখ, তুমি যেন দেরি ক'রো না, আমি

তোমার পথ চেয়ে কিন্তু ব'সে থাকব।

কিছু ভেবো না, আমি যাব আর আসব।

মাস্টার সদর দরজার কাছ বরাবর আসতে, মমতা ব'লে উঠল, কোন ওজর আপত্তি শুনবে না, এমন মোক্ষম ওষুধ নিয়ে আসবে যেন কথা কয়!

মাস্টার দাঁড়িয়ে বড়-গলা ক'রে ব'লে উঠল, মম, তুমি জেনে রাখতে পার, রামময় আমার সঙ্গে ব্যবসাদারি করতে পারে না। স্কুলে আমরা খাবার ভাগ ক'রে খেতাম, বুঝেছ?

মাস্টার হাসিমুখে বেরিয়ে গেল। মমতাও একবুক আনন্দ নিয়ে ওপরে উঠে এল। সে গুণ গুণ ক'রে গান গাইতে গাইতে টেবিল থেকে মাস্টারের ফটোখানা নিয়ে আঁচল দিয়ে ভাল ক'রে সেখানা মুছে ফটোটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে রঙ্গিন স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটল, তারপর সে সযত্নে ফটোখানি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে, গুণগুণানো মন নিয়ে কাজকর্ম করতে লেগে গেল।

এদিকে দশটা বেজে গেল, মাস্টারের দেখা নেই, মমতা কিছুটা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। এগারটা বাজতে মমতার চঞ্চলতা, অস্থিরতায় পরিণত হ'ল। সে একবার ঘর, একবার বার করতে লাগল। নিজের মনকে মাঝে মাঝে এই ব'লে সে প্রবোধ দিচ্ছিল, দেরি তো হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ওখানে কথাবার্তা ক'য়ে দেখিয়ে শুনিয়ে ওষুধ কিনে আনতে দেরি হবে বই কি, এতো আর ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো নয়!

কিন্তু বারটা বাজতে সে দুর্ঘটনার কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেল। সে ওপর-নীচ শুরু ক'রে দিলে, যুক্তিতর্ক তার কোথায় ভেসে গেল। সে এক সময় কাঁদ কাঁদ হ'য়ে একটু চেঁচিয়েই ব'লে উঠল, কেন মরতে আমি পাঠাতে গেলাম, নয় পুরোপুরি টাকই প'ড়ে যেত!

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার এমন অবস্থা এল, সে ক্ষেপে যায় আর কি ! এমন সময় কড়ানাড়ার শব্দ হ'ল, মমতা পড়ি কি মরি ক'রে ওপর থেকে ছুটে নীচে চ'লে গিয়ে খিল খুলতে খুলতেই জিজ্ঞাসা করলে, তোমার, তোমার এত দেরি হ'ল যে !

মাস্টার দরজার ওধার থেকেই উত্তর করলে, রামময়ের ওখানে লোকে লোকারণ্য।

ওষুধ, ওষুধ এনেছ ?

মাস্টার দরজা ঠেলে খুলে ক্লান্ত দেহখানা নিয়ে ভেতরে ঢুকল, হাত দুটো তার খালি।

মমতা মাস্টারের খালি হাত দেখে মনে মনে ব'সে পড়ল, মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে গেল, তা হ'লে ব্যবস্থা হ'ল না, ওষুধ পেলে না ?

এস, বলছি।

মমতা একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়ল। মাস্টার দরজা বন্ধ ক'রে এগ'তে লাগল। মমতা পা দুটোকে টানতে টানতে মাস্টারকে অনুসরণ করতে লাগল। ওপরের ঘরে গিয়ে মমতা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, তা হ'লে কি কোন আশা নেই !

মাস্টার এবার হেসে ফেললে। মমতার মনে আশার বিদ্যুৎ চমকে উঠল, সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, হাসলে যে !

মাস্টার গম্ভীর হ'য়ে পকেট থেকে একটি ওষুধের শিশি বের ক'রে মমতার সামনে ধ'রে রইল।

মমতা শিশিটা মাস্টারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে। তার আনন্দে বাগ্‌রোধ হ'য়ে গেল।

মাস্টার মমতাকে একটু আদর ক'রে ফেলে হাসিমুখে বললে, আচ্ছা, তুমি কী ! তুমি একথা ভুলে গেলে কেন মম, রামময় আমার নেংটো বেলার বন্ধু, আর শুধু তাই নয়, ছেলেবেলায় আমাদের এমন কোন

গোপন কথা ছিল না, যা আমরা পরস্পর পরস্পরকে বলতাম না, একসঙ্গে শোয়া, বসা, চলাফেরা ক'রেই আমাদের দিন কেটেছিল।

মমতা এবার হেসে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, উনি কি বললেন ?

বলবে আবার কি! প্রথমে যেতেই একঘর লোকের সামনে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠল, 'কেমন আছিস, আসিস না কেন ? আয়, ব'স্।' রোগী দেখা শেষ ক'রে সে বললে, 'আয়, একটু প্রাণ খুলে কথা কই। রোগী দেখে দেখে হাঁফিয়ে উঠি, মনের মত লোক পাই না যে একটু গল্প করি। তারপর তোর কি খবর বল্, বউ কি রকম যত্ন আত্তি করছে ? তোর বউ কিন্তু বড় ভাল নগিন, বেড়ে বউ পেয়েছিস!'

মমতা বাঁকা চাহনির সঙ্গে ব'লে উঠল, যা!

সত্যি বলছি মমতা।

তারপর ?

তারপর আমার কথা ওকে বললাম। আমাকে খুব ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বেশ খানিকক্ষণ ও চোখ বুঁজে ব'সে রইল। তারপর এল মোটা মোটা বই। ঝাড়া একটি ঘণ্টা ও নীরবে বইএর মধ্যে ডুবে রইল। ওর তখন মুখ দেখে কি মনে হচ্ছিল জান, মমতা ?

কি ?

ও পরাভব মানে না, জানে না।

তারপর ?

বললে, 'তোর বউকে বলিস নগিন, রামময় যদি তোর মাথায় চুল গজাতে না পারে, ও ডাক্তারি চিরকালের জন্যে ছেড়ে দেবে। তবে একটা কথা, আমার ওষুধের সঙ্গে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে, চুলের ব্যায়াম করতে হবে।'

চুলের ব্যায়াম আবার কি!

ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়, রাত্রে শোবার সময় আধ ঘণ্টা ধ'রে চেপে

চেপে চুল আঁচড়ানো আর আধ ঘণ্টা ধ'রে যে তেলটা দিয়েছে ঘ'ষে ঘ'ষে মাথা।

কিন্তু গোড়াগুলো তো আলগা হ'য়ে আছে, চেপে চেপে আঁচড়ালে চুলগুলো তো সব উঠে যাবে ?

এ কথা আমিও ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বললে, 'পরগাছা রেখে লাভ কি মাস্টার ? জঙ্গল পরিষ্কার না করলে আলো বাতাস খেলবে কী ক'রে ? আসল কথাটা কি জান মাস্টার, চুলের গোড়ায় রীতিমত রক্ত সঞ্চালন হওয়া দরকার।'

ফাঁক ফাঁক চুল গজাবে না তো ?

না না, তুমি কি যে বল ! রামময় কি বললে জান ?

কি ?

বললে, 'তিন মাসের মধ্যে তোর প্রত্যেকটি উঠে যাওয়া চুলের গোড়া থেকে জন্মাবে কিশলয়। নগিন, এ আমার শুধু কথার কথা নয়, আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তোর মাথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে নরম চুলের ক্ষেত।

মমতা মহাখুশী হ'য়ে ব'লে উঠল, উনি বুঝি লিখতে পারেন ?

কেন বল তো ?

কিশলয় কথাটি লেখক ছাড়া বড় একটা কেউ ব্যবহার করেন না কিনা, তাই বলছি।

মাস্টার আনন্দে এক রকম লাফিয়ে উঠে ব'লে উঠল, তুমি ঠিক ধরেছ তো ! এই না হ'লে তুমি আমার মম ! সত্যি, ছেলেবেলা থেকেই ও লিখত, এখন জানতে পারলাম ও ছদ্মনামে লেখে।

ভারি সুন্দর লোক। রোগীদের সঙ্গে রস মিশিয়ে কথা কওয়াই তো উচিত, তাদের মরা প্রাণে জোয়ার আসে।

মাস্টারের আনন্দ উপচে পড়তে লাগল।

৮

বিকেল বেলায় কিমা এল। মমতা সযত্নে কোপ্তা করতে লেগে গেল। মাস্টার তাদের বিবাহিত জীবনের মধ্যে এই প্রথম রান্নাঘরে ব'সে মমতাকে সাহায্য করতে শুরু ক'রে দিলে।

ফুরফুরে মন নিয়ে রাত্রে দুজনে খেতে বসল। কোপ্তার বাটিটা প্রকাণ্ড দেখে মাস্টার ব'লে উঠল, একি মম, আমাকে সব দিয়েছ! তোমার কই?

আছে।

দেখি তোমার বাটিটা?

মমতা হেসে ফেলে বললে, ও আর কি দেখবে, বলছি তো আছে।

না নেই, দেখি বাটিটা?

তুমি খাও না বাপু!

মাস্টার একখানি লুচিতে কোপ্তা পুরে হঠাৎ মমতার মুখেতে সেটি ঠেসে ধরলে। মমতা উহুঁ উহুঁ করতে লাগল। মাস্টার চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠল, খাও বলছি!

মমতা সেটা চিবতে চিবতে মাস্টারকে আর একখানা লুচিতে কোপ্তা পুরতে দেখে ব'লে উঠল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!

আমি তোমার কোন কথা শুনব না, আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তোমাকে আজ খেতে হবে।

আমি তা হ'লে ম'রে যাব।

মাস্টার কিন্তু ছাড়লে না, আরও পাঁচ সাতবার জোর ক'রে খাইয়ে দিলে। শেষের লুচিখানা চিবতে চিবতে মমতা হেসে ব'লে উঠল, আজকে আমার কোন্ দিনের কথা মনে পড়ছে, জান?

কোন্ দিনের কথা মম?

সেই আমাদের বিয়ের রাতের কথা। তুমি আমার মুখে সন্দেশ দিতে

এলে আমি দাঁতে দাঁত চেপেছিলাম। কিন্তু তোমার হাতের এত জোর, আমার দাঁত ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হ'ল, আমি ভয়ে-ময়ে দাঁত ছেড়ে দিলাম।

মাস্টার খুব হাসতে হাসতে ব'লে উঠল, তোমার মনে আছে মম, তুমি খাওয়াতে এলে, আমি তোমার আঙ্গুল কামড়ে দিয়েছিলাম।

ও বাবা, তা আর মনে নেই, সে কথা ভাবলে এখনো আমার আঙ্গুলটা টনটন ক'রে ওঠে!

বেশ হাসিখুশির মধ্যে দিয়েই খাওয়া সাঙ্গ হ'ল। খাওয়ার পর মাস্টার ওপরে গিয়ে রীতিমত পায়চারি শুরু ক'রে দিলে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে মমতা ওপরে এসে বললে, এইবার চল, চুল আঁচড়ে তেল মাখিয়ে দিই।

একটু পায়চারি ক'রে হজম ক'রে নি মমতা।

হজম আর কি করবে, আমাকেই তো সব খাওয়ালে। নাও চল।

মাস্টার গিয়ে খাটের ওপর চিতপাত হ'য়ে শুয়ে পড়ল। মমতা ব'লে উঠল, উঠে বস।

তারপর সে সরু-মোটা চিরুনি নিয়ে এসে, ঘড়ি ধ'রে বেশ চেপে চেপে আঁচড়াতে লেগে গেল। অল্পক্ষণ পরে সে বললে, লাগছে না তো?

মাস্টারের রসিকতা জেগে উঠল। সে উত্তর করলে, ওই নরম হাতে আবার লাগবে!

হাত আমার নরম হ'তে পারে কিন্তু চিরুনিটা তো আর নরম নয়!

ওই নরম হাতে যা পড়বে সবই নরম হ'য়ে যাবে মম। আমার মত কাঠখোট্টা পর্যন্ত মাখন হ'য়ে গেল!

তাই না কি!

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। ঘড়ি ধ'রে পাকা আধ ঘণ্টা চুল আঁচড়াবার পর, তেল ঘষার পালা এল। তেল ঘ'ষে ঘ'ষে মাথাতে মাথাতে মমতা ব'লে উঠল, দেখ, শিশিটা বেশ বড়, বেশী ক'রে মাথালেও প্রায় এক মাস হেসে-খেলে চলবে। আমার তো তেলটা বেশ ভাল জাতের ব'লে মনে হচ্ছে।

কেন বল তো?

দেখছ না সোনার মত রং।

মাথায় তা হ'লে গয়না তৈরি হবে বল?

নিশ্চয়ই। চুলই তো মাথার আসল গয়না। একমাথা চুল থাকলে কি সুন্দর দেখায় বল তো?

এখন তা হ'লে আমি বিশ্রী?

বিশ্রী কেন, চুল বেরলে তোমাকে আরো সুন্দর দেখাবে।

মাস্টার আবেগের সঙ্গে মমতার বাঁ হাতখানি চেপে ধরলে। মমতা হেসে বললে, হাত ছাড়, নইলে ঘ'ষে ঘ'ষে তেল মাথাব কেমন ক'রে?

থাক মাথানো।

মাস্টার হ'য়ে ছেলেমানুষি করছ!

আমি কি চব্বিশ ঘণ্টাই মাস্টার থাকব নাকি?

এখন চুপটি ক'রে একটু ব'সে থাক।

মাস্টার আবেগের মধ্যেই চুপ ক'রে ব'সে রইল। তেল মাথানো হ'য়ে গেলে মমতা শিশিটা খাটের মাথার দিকের তাকে সযত্নে তুলে রাখলে। হাত ধুয়ে এসে মশারি টাঙ্গাতে গেলে, মাস্টার ব'লে উঠল, মশারি না টাঙ্গিয়ে বরং পাখা আরো এক পয়েন্ট বাড়িয়ে দাও, যদি মশা কামড়ায় আমি ফেলে দোবো'খন। তুমি শোও।

পাখা এক পয়েন্ট বাড়িয়ে আলো নিবিয়ে মমতা শুয়ে পড়ল।

৯

তখন বেশ ভরা রাত। কাতরানির আওয়াজে হঠাৎ মমতার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসতে বসতে সভয়ে ব'লে উঠল, কে কাতরাচ্ছে! কে?

মাস্টার কাতরাতে কাতরাতে উত্তর করলে, আমি, আমি মমতা, আলোটা জ্বাল।

মমতা তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে মাস্টারের দিকে চেয়ে আঁতকে ব'লে উঠল, তোমার মাথা থেকে যে বড্ড রক্ত বেরচ্ছে, এ সর্বনাশ কি ক'রে হ'ল?

মাস্টার কাতরতার সঙ্গে উত্তর করলে, বড্ড মশা কামড়াচ্ছিল, মশারি টেনে ফেলতে গিয়ে শিশিটা মাথায় এসে পড়ল।

মমতা বিহ্বল হ'য়ে আঁচল দিয়ে মাস্টারের কপাল, মাথা পুঁছিয়ে দিতে দিতে আবার আঁতকে ব'লে উঠল, অনেকখানি গর্ত হ'য়ে গেছে যে! আবার ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরচ্ছে, এখন আমি কি করি, কী ক'রে রক্ত থামাই!

মাস্টার কষ্ট চাপতে চাপতে মুখে একটু হাসি টেনে এনে ব'লে উঠল, ও কিছু নয় মম, তুমি এক কাজ কর, ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে জোরে জোরে চেপে ধর, তা হ'লেই রক্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে।

মমতা কিন্তু মাস্টারের কথায় মোটেই আশ্বস্ত হ'ল না, বরং সে 'আমি কি করি, আমি কি করি' বলতে বলতে আলুথালু হ'য়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। ফড়ফড় শব্দে একখানা আস্ত কাপড় ছিঁড়ে ন্যাকড়া নিয়ে সে কুঁজোর দিকে ছুটে গেল। কুঁজো থেকে ন্যাকড়ার ওপর হুড়হুড় ক'রে জল ঢালতে ঢালতে তার হাত পিছলে কুঁজোটা প'ড়ে গিয়ে চৌচির হ'য়ে ভেঙ্গে গেল। ঘর জলে থইথই করতে লাগল। মমতার কিন্তু

কোন দিকে হুঁশ নেই, সে পাগলের মত ছুটে এসে মাস্টারের কাটা জায়গাটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে চেপে ধরলে। পাঁচ সাত বার ছুটোছুটি ক'রে জল ন্যাকড়া বদলে চেপে ধরতে ধরতে মাস্টারের রক্ত পড়া বন্ধ হ'ল।

মাস্টার ম্লান হেসে ব'লে উঠল, দেখলে তো মম, রক্ত বন্ধ হ'য়ে গেল। অত বিহ্বল হ'য়ে পড়ে! নাও শুয়ে পড়, কোন চিন্তা নেই।

মাস্টার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। মমতা বাকী রাতটা জেগে কাটালে।

পরদিন সকালে মাস্টারের মাথা, কপাল বেশ ফুলে উঠল। মমতার অস্থিরতা বাড়ল। দুপুর নাগাত মাস্টারের বেশ শীত ক'রে জ্বর এল। ডাক্তার এলেন, পরীক্ষার পর জানালেন, 'খুব সম্ভব ক্ষত দূষিত হ'য়ে গেছে।' সন্ধ্যায় আবার এসে বললেন, 'ক্ষত নিঃসন্দেহে দূষিত হ'য়ে গেছে। মাথার ব্যাপার, খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

তারপর চলল চিকিৎসা আর সেবা শুশ্রূষা। শুধু ওষুধ দিয়ে কিছু ফল হ'ল না, অবশেষে অস্ত্র-চিকিৎসার সাহায্য নিতে হ'ল। সামনের মাথার তিন চার জায়গায় চিরে পুঁয বের ক'রে দেবার পর জ্বর কমতে শুরু হ'ল। মাস্টার দিন পনের ভুগল।

গতকাল সন্ধ্যায় ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হয়েছে। ঘা এখন একেবারে শুখিয়ে গেছে কিন্তু সামনের মাথায় একগাছিও চুল নেই, শুধু চেরার দাগগুলো কটমট ক'রে তাকিয়ে আছে।

আজ মাস্টার ঝোল-ভাত খেতে বসেছে, মমতা সামনে ব'সে এটা ওটা দিচ্ছিল। মমতার শত চেষ্টা সত্ত্বেও, চোখ তার মাঝে মাঝে অসংযত হ'য়ে মাস্টারের সামনের মাথাটার ওপর গিয়ে গিয়ে পড়ছিল, সে শিউরে শিউরে উঠে, চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছিল। তার বুকের ভেতরটা হুহু ক'রে উঠছিল।

একথা সেকথার পর মমতা ব'লে উঠল, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমার জন্যেই তোমার এত দুর্ভোগ, এত দুরবস্থা ! এর চেয়ে আমার মরণ ছিল ভাল !

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে মাস্টার ব'লে উঠল, ওকথা ব'লো না মমতা, তুমি না থাকলে আমাকে কে বাঁচাত, বল ? শুনলে না, রামময়ের সার্জেন বন্ধু কি ব'লে গেল !

সেবা না ছাই, মরণের পথে ঠেলে দিয়ে !

মাস্টার এবার একটু হেসে উত্তর করলে, এতো ভালই হ'ল মমতা, আমরা তো চেষ্টার কসুর করলাম না, আর আমাদের মাথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

মমতা আরো দুখানা মাগুর মাছের টুকরো মাস্টারের পাতে দিলে, খাওয়া চলতে লাগল।

হাসি

১

তেরশ পঞ্চাশ সালের শেষের দিক। সন্ধ্যে সাতটার বর্ধমানগামী ট্রেনে ব'সে নীরবে আকাশ পাতাল চিন্তা করছি। ট্রেন লিলুয়া পেরল, বেলুড় পেরল। ক্রমে ক্রমে চিন্তার ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল, একটি মাত্র চিন্তা, আর তো পারি না, কি ক'রে সংসার চালাই! ছেলেপিলেদের দু বেলা দু মুঠো ভাত পর্যন্ত খেতে দেবারও উপায় নেই, চাল দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য! কে ছোঁবে! টেনে বাজিয়ে তো চলেছি, আর কত টেনে বাজাব! অর্ধভুক্ত ছেলেপিলেরা ছাড়ে না, এটা কিনে দাও, ওটা কিনে দাও আবদার ধরে, বড্ড খিদে পেয়েছে বলে, 'বাবা আর যে পারি না' ব'লে ব'সে পড়ে। তাও কি ছাই জোর ক'রে বলতে পারে! ধীরে ধীরে ক্ষীণস্বরে বলে। অধিকাংশ কথাই তাদের গলার মধ্যে আটকে যায়, দুর্বলতায় বেরতে পারে না। তাদের চেহারাগুলো দেখলে প্রাণে আমার হুতাশ আসে। পাঁজরাগুলো গোনা যায়, চেহারা সাদা, সর্বদাই তারা ধুঁকছে। হাড়গুলো যে ঢেকে দেবো তারও উপায় নেই, ছেলেপিলেরা উলঙ্গ থাকে। কী করব, কাপড়জামা কোথায় পাব, টাকা কই? ভাতই জোটাতে পারি না, আবার কাপড়জামা! কাপড় জামা তো বাবুগিরি! ভগবান, তুমি আমাকে অসীম ধৈর্য দিয়েছ কিন্তু এ ধৈর্যতেও তো কুল'তে পারছি না!

চমকে উঠলাম। হাসির আওয়াজ না? হ্যাঁ, হাসিই তো। এমন দিনে এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারছে কে। ও, কে?
কখন উঠে পড়েছি জানি না। বড় কামরা, দু ভাগে ভাগ করা, মধ্যে যাতায়াত করবার অপ্রশস্ত একটি রাস্তা। ওই রাস্তা ধ'রে কখন যে কামরার অপরাংশে গিয়ে পড়েছি তাও জানি না, দূরে জানলার ধারে রোদে-পাকা একজন লোককে প্রাণখোলা হাসি হাসতে দেখে চমক ভাঙল। মনে মনে ভাবলাম, এই দুর্দিনে কী ক'রে এমন প্রাণখোলা হাসি ওর আসছে! আমি, আমি তো হাসতে পারি না! লোকটা পাগল নয় তো? না, পাশের লোকটির সঙ্গে বেশ তো কথা কইছে আর হোহো ক'রে হেসে উঠছে! অবস্থাপন্ন ব'লেও তো মনে হয় না! কাপড় জামা তো ময়লা, জামার কাঁধ তো ছেঁড়া, মাথা তো রুক্ষ! তবে?
বিচারবুদ্ধি আলো দেখাতে পারলে না। লোকটিকে কিন্তু ভাল লাগল। মনে মনে ভাবলাম, বড় ভাগ্যবান, সত্যি বড় ভাগ্যবান! ধীরে ধীরে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলাম, হাসির মাদকতা তখন আমার শিরায় শিরায়, তাতেই ডুবে রইলাম।

২

পরদিন আমার অস্থিরতায় কাটতে লাগল। সারাদিন অফিসে ভাল কাজ করতে পারলাম না, মন আমার উড়ু উড়ু, মনে অশ্রান্ত আকুলতা, কখন গিয়ে ট্রেনে বসব!
ছুটি হ'তেই স্টেসনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সারা ট্রেনটা খুঁজলাম, ইচ্ছে, লোকটির পাশে গিয়ে আজ আমি বসব, তাকে জিজ্ঞাসা করব, সে এমন হাসি হাসতে পারছে কী ক'রে? তাকে কিন্তু পেলাম না। গার্ড বাঁশি বাজালে। তাড়াতাড়ি ক্ষুণ্নমনে বড় কামরাতেই উঠে বসলাম।

ট্রেন লিলুয়া পেরল, বেলুড় পেরল। চমকে উঠলাম, বিড়বিড় ক'রে ব'লে উঠলাম, ওই তো সেই হাসির আওয়াজ!

তাড়াতাড়ি ওধারে গিয়ে দেখি, সেই লোকটাই হাসছে, সেই প্রাণখোলা হাসি! মনে মনে ভাবলাম, লোকটি কি সুখী, সত্যি কী সুখী!

সে জানলার ধারে বসেছিল, কাছাকাছি বসবার জায়গা না পেয়ে আমি জানলার ধারে দরজা চেপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তন্ময় হ'য়ে তার হাসি, কথাবার্তা, উপভোগ করতে লাগলাম।

ওধারের একজন বৃদ্ধলোক ব'লে উঠল, বলি, শুনছেন ?

কথাগুলো কানে এসে বিঁধতে, কেন জানি না চমকে ব'লে উঠলাম, অ্যাঁ!

বৃদ্ধলোকটিকে আমার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, আমায় কিছু বলছেন ?

লোকটি মুখ বিকৃত ক'রে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনার তো খুব আক্কেল মশাই, হাওয়াটা আটকাচ্ছেন! দাঁড়াবার আর জায়গা পেলেন না!

আজ্ঞে—

বলি, এই সাদা কথাটা মাথায় ঢুকছে না!

আমি কাঁচুমাচু হ'য়ে পড়লাম। আমার চোখদুটি, যে লোকটিকে উপলক্ষ ক'রে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তার দিকে গিয়ে পড়ল। লোকটি হেসে আমায় বললে, আপনি বরং আমার পাশে এসে বসুন মশাই, জায়গা কোনরকমে হ'য়ে যাবে কিন্তু হাওয়া আটকাবেন না মশাই, হাওয়া আটকাবেন না।

বৃদ্ধ লোকটির দিকে একবার চেয়ে সে আমায় হেসে বললে, উনি তো ঠিকই বলেছেন, উনি তো আর মালগাড়ির টিকিট কাটেন নি, টিকিটের দামের মধ্যে যে হাওয়ার দামটা ধরা আছে, এ বুঝি জানেন না!

এই ব'লে লোকটি হোহো ক'রে হেসে উঠল। বৃদ্ধ লোকটি সারা মুখখানি

বিকৃত ক'রে ব'লে উঠল, পাগল নাকি! এত হেসে মরছে কেন!
লোকটির প্রাণখোলা হাসি আরো বেড়ে গেল। আমি আড়চোখে লোকটিকে দেখতে লাগলাম। যতই তাঁকে দেখতে লাগলাম, ততই তাকে আমার ভাল লাগতে লাগল। তার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে মন আমার ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। ফাঁক খুঁজতে লাগলাম কিন্তু ফাঁক পেলাম না, লোকটি যে আপন হাসিতেই মশগুল!

৩

অপূর্ণ মন নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। মনের প্রতিচ্ছায়া মুখে হয়তো পড়েছিল, স্ত্রী শুতে এসে কিছু আশঙ্কার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, তোমার হয়েছে কি? তুমি আজ এত অস্থির কেন?
অস্থির, কেন অস্থির জান রাণী, আমি হাসতে পারি কই? আমি আগে তো খুব হাসতাম। এই তো মোটে দশ বছর আগেকার কথা, বাসর ঘরে আমার হাসিতে সকলে তো মেতে উঠেছিল? ফুলশয্যার রাত্রে আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমায় তোমার পছন্দ হয়েছে? তুমি ছোট্ট ক'রে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানিয়েছিলে। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম, এরই মধ্যে আমার ভেতর কী এমন দেখতে পেলে, যাতে আমাকে তোমার ভাল লাগল? তুমি হাসিহাসি মুখখানি অবনত ক'রে নীরবে ব'সে রইলে। আমি যখন উত্তরের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম, তুমি শুধু উত্তর করলে, তোমার হাসি। এও তো বেশী দিনের কথা নয় রাণী, মাত্র তো আট বছর আগেকার কথা, যেদিন বড়খোকা আমাদের এল, বড়খোকা তখনও ভূমিষ্ঠ হয় নি, তুমি যন্ত্রণায় ছটফট করছ, মাসুপিসি একটু উঠে যেতেই আমি চুপি চুপি গিয়ে তোমায় জিজ্ঞাসা করলাম, বড্ড কষ্ট হচ্ছে রাণী? তুমি কাতরাতে কাতরাতে বললে, ওগো, তুমি একবার হাসবে? আমি

হাসতে, তুমি ব'লে উঠেছিলে, আ ! তারপর হাসিমুখে আমাকে ব'লে উঠেছিলে, তোমার হাসি আমার যন্ত্রণা কেড়ে নিলে। কিন্তু রাণী, এখন, এখন আমি হাসতে পারি কই ?

স্ত্রী আমার মাথায় হাত বুলতে বুলতে সান্ত্বনা দিয়ে ব'লে উঠল, যা দিনকাল পড়েছে, এখন কেউ হাসতে পারে না।

আমি ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে বললাম, পারে রাণী পারে ! আমি দু দিন ধ'রে একটি লোককে প্রাণখোলা হাসিতে ডুবে থাকতে দেখছি !

তিনি হয়তো অবস্থাপন্ন।

না রাণী না, ময়লা ছেঁড়া জামা পরে, দেখলে মোটেই অবস্থাপন্ন ব'লে মনে হয় না ! পাড়াগাঁয়ের রোদে-পাকা চেহারা ! আর রাণী, এ হাসি তো টাকার হাসি নয়, টাকার গরমের হাসি আমি তো অনেক শুনেছি ! তবে হয়তো—

রাণীর চাহনি দেখে ও কী সন্দেহ করছে ঠাওরাতে পেরে, ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব'লে উঠলাম, তুমি যা মনে করছ, ও তা নয় রাণী, লোকটি পাগল নয়, একথা তোমায় আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। আমাকে জানতে হবে রাণী, কী গুণে ও গুণী।

রাণী আমার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললে, বেশ তো, দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রো। এখন শুয়ে পড়, বড্ড রাত হ'ল।

শুয়ে পড়লাম, চোখ বুঁজেও রইলাম কিন্তু ঘুম আজ আমার কিছুতেই আসতে চাচ্ছিল না। ভোরে অপূর্ণ মন নিয়েই উঠে পড়লাম।

৪

সারাদিন চড়াই পাখির মত একবার এখানে একবার ওখানে ক'রে কাটাতে লাগলাম। অফিসে কালিতে কলম পর্যন্ত ডোবাতে পারলাম না।

আজ শনিবার, দুটোয় ছুটি হ'য়ে গেল। সকলে চ'লে গেল, আমি কিন্তু র'য়ে গেলাম, মনে আমার ধারণা জন্মাল, লোকটি রোজ নিশ্চয়ই সন্ধ্যে ছটার ট্রেনে ফেরে। ওকে ধরতে গেলে ওই ট্রেনেই যেতে হবে।

ছটার ট্রেনে গিয়ে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বসলাম। এ ট্রেনটায় আজ তেমন ভিড় নেই, শনিবার, আগেকার ট্রেনে অনেকেই চ'লে গেছে। মনে মনে ভাবলাম, হাসি তো বেলুড়ের পর থেকেই শুনতে পাই, নিশ্চয়ই লোকটি বেলুড় থেকে ওঠে, আর এই বড় কামরাখানাতেই ওঠে। মুখ বাড়িয়ে ডাকব, আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে।

ট্রেন লিলুয়া পেরতেই অস্থির হ'য়ে পড়লাম, বেলুড় যতই কাছে আসতে লাগল, অস্থিরতা আমার ততই বাড়তে লাগল। বেলুড়ে ট্রেন থামবার ঢের আগেই অসংযত হ'য়ে স্টেসনের দিকে মুখ ক'রে জানলা দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একজন সহযাত্রী আমার জামার পিছন ধ'রে সজোরে টানতে টানতে বলতে লাগল, কি করছেন, মাথাটা যে পোস্টে লেগে একেবারে গুঁড়িয়ে যাবে।

হুঁশ এল, মাথাটা ঢুকিয়ে নিয়ে হাঁফাতে লাগলাম। বেলুড়ে ট্রেন ঢুকতেই আবার অসংযত হ'য়ে উঠে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অস্থির নয়নে চারিদিকে লোকটিকে খুঁজতে লাগলাম। ট্রেনটা থামতে, খানিকটা দূরে লোকটিকে দেখতে পেয়ে, অস্বাভাবিক চিৎকার ক'রে ডেকে উঠলাম, এই যে, এখানে এখানে, আসুন আসুন।

স্টেসনের কোলাহলে তার হাসির আওয়াজটা শোনা গেল না বটে, কিন্তু সেই হাসি! সে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে কামরায় উঠে বললে, আমাকে যে চিনতে পেরেছেন দেখছি! কেমন আছেন? আমি তো মশাই বেশ আছি, দিব্যি আছি!

লোকটি হোহো ক'রে হেসে উঠল। হাসি কিছু প্রশমিত ক'রে সে ব'লে উঠল, আর কেনই বা থাকব না বলুন? রোজগার করছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি,

ঘুমচ্ছি, চেপে সংসার করছি, একবার বলুন ?

আবার ওই প্রাণখোলা হাসি! লোকটি আমার পাশে বসতেই আমি আকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

কথা, আরে বলুন, ব'লে ফেলুন।

আপনি, আপনি এই দুর্দিনে এমন হাসি কি ক'রে হাসতে পারেন ?

কি ক'রে হাসতে পারি!

লোকটি এবার প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠল। আমি চমকে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়লাম। সে হাসির প্রচণ্ডতা কমিয়ে বললে, শিখতে হয়েছে মশাই, কসরত ক'রে শিখতে হয়েছে!

বালিতে ট্রেন এসে থামল। আমাদের এধারটা খালি ক'রে সব লোক নেমে গেল। আমাকে বিভ্রান্ত হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, সে ব'লে উঠল, কি, বুঝতে পারছেন না, অদ্ভুত ঠেকছে!

হ্যাঁ, হাসি কি ক'রে শেখা যায় ?

শেখা যায় মশাই, শেখা যায়। আমরা হাঁটতে শিখি, কপচাতে শিখি, আর হাসিই বা শেখা যাবে না কেন? জানেন, এমন এক দিন ছিল হাসি আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে ভয় পেত! ছিলাম গাঁয়ের একজন রীতিমত কড়া ধরনের মাস্টার। জোর গলায় ব'লে বেড়াতাম, জীবনের ওজন আছে, জীবনটা ছেলেখেলা নয়, গা দুলিয়ে হেসে ভেসে ভেসে বেড়ানোর জন্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিনি! নিজের, সমাজের, জাতের, দেশের উন্নতি করতে গেলে হাসিখুশি আমাদের ত্যাগ করতে হবে। কঠোর মনোভাব গঠন ক'রে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

লোকটি এবার হেসে বললে, কিন্তু কী বোকাই না ছিলাম আমি!

কেন!

প্রিয়াকে চিনতে পারিনি মশাই, প্রিয়াকে চিনতে পারিনি।

প্রিয়া! প্রিয়া কে?

প্রিয়া কে?

সে এবার জোরে হেসে উঠল। একটু পরে সে ব'লে উঠল, প্রিয়া? প্রিয়া হচ্ছে আমার প্রিয়তম সখি এই হাসি, আর কে? আমি প্রিয়াকে চিনতে চাইনি, কিন্তু প্রিয়া আমায় চিনেছিল। অচল প্রেম বুকে নিয়ে প্রিয়া আমার, অবহেলিতা প্রিয়া আমার, নীরবতাকে সাক্ষী রেখে, আমার মেয়ের মুখের হাসি হ'য়ে, আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকত। আমি তার সংকেত বুঝতে পারি নি, বরং মেয়ে একটু বড় হ'তেই আমি মেয়েকে বোঝাতে শুরু ক'রে দিলাম। ধনুকভাঙা পণ আমার, কাঁচা বয়সেই ওকে নোয়াতে হবে। মেয়ের কিন্তু আটে প'ড়েও হাসি থামল না। আমি যত বোঝাই, ও তত হাসে। আমি রেগে একদিন ঘা কতক দিলাম, মেয়েটা কাঁদল, কিন্তু আড়াই পা যেতে না যেতেই আবার তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমি হাল ছাড়লাম না, দ্বিগুণ উৎসাহে মেয়েকে বুঝিয়ে, ধমকে, ভয় দেখিয়ে, মেরে, এগতে লাগলাম। তারপর এসে পড়ল আমাদের ওধারে দুর্ভিক্ষ। তিরিশ চল্লিশ খানা গ্রাম জুড়ে দুর্ভিক্ষ নাচন শুরু ক'রে দিলে। মড়ক এসে নাচের সঙ্গে গান ধরলে। লোক পালাতে শুরু করলে। আমি চেঁচিয়ে ব'লে বেড়াতে লাগলাম, বলি, সব পালাচ্ছ কোথায়? কোথায় যাবে? সর্বাঙ্গে যে ঘা? বললে কি জানেন! ভারি মজার কথা বললে। এই ব'লে লোকটি হো-হো ক'রে হেসে উঠল। তারপর হাসি থামিয়ে সে বলতে লাগল, ওরা বললে, 'কেন, কলকাতায় যাব, কতবড় শহর, রাজধানী, কত ধনী লোকের বাস, আমাদের হিল্লে হ'য়ে যাবে, আমরা পেট ভ'রে খেতে পাব। এখানে না খেতে পেয়ে মরব কেন?' একবার মজার কথাগুলো শুনুন! আমি ওদের ব'লে উঠলাম, তবে যাও, পেট ভ'রে খাও গে!

চার পাঁচ দিন যেতে না যেতে স্ত্রী আমার ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি সবিশেষ কাতরতার সঙ্গে বললেন, নন্দীরা চ'লে গেছে, বিশ্বাসরাও গেছে, চাটুজ্যে, মুখুজ্যে সকলেই গেছে, বোসেরা কিছুতেই যাবে না বলেছিল, তারাও আজ চ'লে গেল! আর এখানে থাকা কিছুতেই যায় না, কি ভরসায় থাকব বল?

কোথায় যাবে?

কেন, কলকাতায়!

কলকাতায় গিয়ে কি করবে? পথে পথে কুকুর বেড়ালের মত মরবে?

আমি তোমাদের আর শাক পাতা রেঁধে দিতে পারব না!

ভাত না খেয়ে শাকপাতা খেয়েও লোকে এখানে বাঁচতে পারবে, কিন্তু শুধু কলকাতার হাওয়া খেয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না! আর থাকবে কোথায়?

স্ত্রী বিরক্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন। আরো দু দিন কাটল। তৃতীয় দিন সকালে, স্ত্রী আমার ভীষণ অধৈর্য হ'য়ে এসে বললেন, আজ আমি কিছুতেই থাকব না। আচ্ছা, তুমি কী! বনমালী মোড়ল যে লিখতে পড়তে পর্যন্ত জানে না, সেও কলকাতায় যেতে ভরসা করলে, আর তুমি লেখা পড়া শিখেও এ ভরসাটুকু করতে পারছ না! আর এও তো শুনতে পাচ্ছ, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্যে কলকাতায় সুন্দর বন্দোবস্ত করা হয়েছে!

কে তোমায় বললে?

আমার কথার জবাব দেবার আগেই স্ত্রীর হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়াতে তিনি আঁতকে উঠলেন। একেবারে আলুথালু হ'য়ে দৌড়ে যেতে যেতে বললেন, তোর এমন দশা কি ক'রে হ'ল রে, রক্তগঙ্গা ব'য়ে যাচ্ছে যে রে!

আমি ফিরে দেখি, দূরে আমাদের মেয়ে মানু দাঁড়িয়ে, তার সারা মুখ রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে।

স্ত্রী মানুকে জড়িয়ে ধ'রে আর্তনাদ করতে লাগলেন। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কপালটা এতখানি কি ক'রে কাটল মানু?

মানু স্ত্রীর আর্তনাদে হকচকিয়ে গিয়েছিল। আমার কথায় তার সে ভাব কেটে গেল। সে ভারিক্কী চালে বললে, বাড়িতে তো চাল নেই, কি করি, ময়নাদীঘিতে শাক তুলতে গিয়েছিলাম। শাক তুলছি, সুরমার মা ছুটে এসে বাবা, আমায় ধাক্কা দিতে দিতে বললে, 'আমাদের পুকুরে শাক তুলতে এসেছিস যে! আমরা এই শাক খেয়ে ব'লে বেঁচে আছি! আবার ভাগ বসাতে এসেছে, বেরো, দুর হ!' সুরমার মা খুব জোরে ধাক্কা দিতে আমি প'ড়ে গেলাম বাবা।

স্ত্রী চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, আর এক দণ্ডও এ পোড়া দেশে আমি থাকব না।

মানু সাগ্রহে হেসে ব'লে উঠল, কাজ নেই বাবা এখানে থেকে, চ'লে চল আমরা কলকাতায় যাই, কলকাতায় পেট ভ'রে ভাত খেতে দেয়।

আমি একথার কোন জবাব না দিয়ে, মানুর ক্ষতস্থান পরিষ্কার ক'রে পটি বেঁধে ওকে শুইয়ে দিয়ে বললাম, তোমাকে না আমি ব'লে দিয়েছি মানু, তুমি যখন তখন হাসবে না!

একটু থেমে আমি আবার বললাম, এ রকম হাসবে না, বুঝলে?

দু দিনের মধ্যে অবস্থা চরমে উঠল। দু এক ঘর ছাড়া গ্রামের সব লোকই কলকাতার উদ্দেশে চ'লে গেল! স্ত্রী এ দু দিনের মধ্যে আমাকে কিছু আর বলেন নি। তৃতীয় দিন কিছু অন্ন সংগ্রহ করবার জন্যে ভোরে উঠে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, দুপুরে রিক্ত হস্তে বাড়িতে পা দিতে না দিতেই কোথা থেকে মানু দৌড়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে

ব'লে উঠল, বাবা, মা সকালে শাক তুলে এনে ঘরে ঢুকে শাকগুলো রাখতে রাখতে প'ড়ে গেছে, সেই থেকে আর উঠছেও না, কথাও কইছে না!

আমি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে দেখি, স্ত্রী অজ্ঞান হ'য়ে দাঁতি লেগে প'ড়ে আছেন। তাড়াতাড়ি চোখে মুখে সজোরে জলের ঝাপটা দিতে দিতে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাঁর দাঁতি লাগা ছাড়ল। তিনি গোটা কতক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চোখ চাইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কেমন আছ?

তিনি ক্ষীণস্বরে বললেন, ভাল।

তিনি জোর ক'রে উঠে শাকগুলো কুড়তে লাগলেন। মান্নু সভয়ে ব'লে উঠল, তুমি উঠ না মা, তুমি উঠ না!

স্ত্রী মান্নুর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। মান্নুও এবার হেসে ব'লে উঠল, তা হ'লে তুমি বুঝি ভাল হ'য়ে গেছ মা?

হ্যাঁ মা।

আমি ব'লে উঠলাম, তোমরা হাসছ কেন! এর মধ্যে হাসবার কি আছে!

স্ত্রী আমার দিকে একবার কঠিন হ'য়ে চেয়ে আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ঘুরে প'ড়ে গেলেন।

মান্নু চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে তার মা-র কাছে দৌড়ে এল। তারপর সে তার মাকে ঠেলতে ঠেলতে চিৎকার ক'রে ডাকতে লাগল, মা, মাগো, মা!

হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে ব'লে উঠল, কলকাতায় মাকে নিয়ে চল বাবা, মা অনেকদিন ভাত খায়নি, ভাত খেলে মা ভাল হ'য়ে যাবে। মা এখানে কিছু খায় না, যা পায় তোমাকে আমাকে দিয়ে দেয়।

৫

পরদিন কলকাতায় যাবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মানুর আর আনন্দ ধরে না। প্রতিটি কথা সে হেসে হেসে বলতে লাগল। আমি এক সময় ব'লে উঠলাম, আবার তুমি যখন তখন হাসছ?

আমার কথা তার কানেই গেল না। সে ব'লে উঠল, কলকাতায় গিয়ে অনেক চাল আনবে বাবা, মা অনেক ভাত রাঁধবে, আমরা পেট ভ'রে অনেক ভাত খাব!

বাড়ি থেকে স্টেশন প্রায় চার ক্রোশ। ক্রোশ দুই যাবার পর স্ত্রীর অবস্থা দেখে একটি গাছের তলা দেখিয়ে তাঁকে বললাম, এখানে বরং একটু বস, জিরিয়ে নাও।

আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। তুমি মানুকে একটু কোলে নাও, ও আর হাঁটতে পারছে না।

মানুকে কিছুদূর কোলে নিয়ে যাবার পর সে ব'লে উঠল, আমাকে নামিয়ে দাও বাবা, আমি ঠিক হেঁটে যেতে পারব। তুমি আমায় কোলে ক'রে হাঁটতে পারছ না, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

সত্যি, আমার কষ্ট হচ্ছিল। আমি মানুকে নামিয়ে দিলাম। মানু হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, কলকাতায় পৌঁছেই আমরা ভাত খেতে পাব, না বাবা? আমি অনেক খাব, মা অনেক খাবে, তুমিও অনেক খাবে, না বাবা?

হ্যাঁ।

তরকারির কিছু দরকার হবে না বাবা, আমরা শুধু ভাত খাব, অনেক, অনেক ভাত খাব!

তাই হবে।

মানুর আর ফুর্তি ধরে না! প্রায় তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করলাম।

স্ত্রী আর চলতে পারছেন না। মান্নুর ফুর্তিও মান্নুকে আর চালাতে পারছে না। মান্নুকে আবার কোলে করলাম, স্ত্রীকে আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলতে বললাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই জনতা চোখে পড়তে লাগল। আমাদের গ্রামের বহুলোককে রাস্তার দু ধারে প'ড়ে থাকতে দেখলাম। প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলাম, দু তিন দিন ধ'রে ট্রেনে কেউ উঠতে পারছে না, অসম্ভব ভিড়।

গ্রামের হলধর এগিয়ে এসে আমায় বললে, মাস্টার মশাই, আর এগিয়ে কি করবেন, ট্রেনে উঠতে পারবেন না।

খুব ভিড় ?

ভিড় ব'লে ভিড়! আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও চার দিন ধ'রে ট্রেনে উঠতে পারছি না।

আমাকে যে উঠতেই হবে হলধর!

উঠতে কিছুতেই পারবেন না মাস্টার মশাই। আর এগবেন না, স্টেসনের ধারে কলেরা লেগে গেছে, রোজ প্রায় শ দুই ক'রে মারা যাচ্ছে। ভয়ানক জলকষ্ট, পাশের খাল শুখিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে, আর ওই শুখনো খালে মড়াগুলো এখন সকলে ফেলছে। আমরা তাই একটু দূরে পালিয়ে এসেছি, আপনি ওধারে যাবেন না।

কেন হলধর, স্টেসনের ওধারেই তো মিলিটারিদের আস্তানা, ওদের তো পরিশুদ্ধ জলের সুবৃহৎ ট্যাঙ্ক রয়েছে ?

পাগলের মত ছুটে সব জল চাইতে গিয়েছিল, কিন্তু জলের বদলে তারা গুলি পেয়েছে, মাস্টার মশাই।

মান্নু অধৈর্য হ'য়ে আমার কোল থেকে নেমে পড়ল। আমাকে চিন্তারত দেখে সে আমার হাত ধ'রে টানতে টানতে বলতে লাগল, চল না বাবা, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে যে, রেলগাড়ি চ'লে যাবে যে, আমাদের ভাত খেতে দেরি হ'য়ে যাবে যে!

স্ত্রী আমার কাঁধে এলিয়ে রয়েছেন। মান্নুর কথা শুনে আমি ন'ড়ে উঠে চলতে শুরু ক'রে দিলাম।

হলধর ব'লে উঠল, মাস্টার মশাই, এখন স্টেসনে যাওয়া কিন্তু উচিত হবে না।

আমি চলতে চলতেই বললাম, কি করব হলধর, আমাকে যে যেতেই হবে, আমাকে যেমন ক'রেই হ'ক কলকাতায় পৌঁছুতেই হবে।

যতই স্টেসনের কাছে আসতে লাগলাম, বুকফাটা কান্নার রোলে আমাদের কানগুলো ভ'রে উঠল। মুখুজ্যেদের মা আলথালু হ'য়ে কোথা থেকে ছুটে একেবারে আমাদের সামনে এসে, চোখ দুটো বড় বড় ক'রে অতি কাতরতার সঙ্গে বললে, তোমরা ওধারে তো যাচ্ছ বাবা, বিপিনকে, বিপিনকে আমার ডেকে দিও! বিপিনকে কাল এরা যে কোথায় ধ'রে নিয়ে গেল, সে আর আসেনি!

তারপর হঠাৎ তিনি চিৎকার ক'রে ডেকে উঠলেন, ওরে বিপিন, তুই কোথায় রে, তুই কোথায় গেলি রে!

বিপিনের ছোট ভাই নবীন ছুটে এসে মাকে ধ'রে ব'লে উঠল, তুমি কী মা! দাদার ছেলে যে তোমায় দিদা দিদা ব'লে অনবরত ডাকছে, তুমি চল, চল।

দাদু আমায় ডাকছে, আমার দাদু আমায় ডাকছে, চল্ চল্, না গেলে ওকে হয়তো বিপিনের মত সকলে ধ'রে কোথায় নিয়ে চ'লে যাবে!

তিনি একরকম দৌড়তে আরম্ভ করলেন। নবীন তাড়াতাড়ি যেতে যেতে চাপা গলায় আমাকে বললে, দাদা কাল রাত্রে কলেরায় মারা গেছে, মাস্টার মশাই।

স্ত্রী মান্নুকে স্পর্শ ক'রে কেঁদে উঠে বললেন, ওগো, আমি যে আর পারি নে!

মান্নুও তার মা-র দেখাদেখি কেঁদে উঠল। আমি স্ত্রীকে বাঁ হাত দিয়ে

ধ'রে বললাম, তুমি কিছু ভেবো না, আমি আজকের ট্রেনেই তোমাদের কলকাতায় নিয়ে যাব।

আমি মান্নুর দিকে চেয়ে বললাম, কাঁদছ কেন মান্নু, চল, চল, পা চালিয়ে চল, ট্রেন যে এক্ষুণি এসে পড়বে!

মান্নু চোখ মুছে জোরে যেতে যেতে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, আমরা ঠিক কখন যাব বাবা? ঠিক কখন ভাত খাব বাবা?

আজই যাব, আজই ভাত খাব।

স্টেসনের কাছাকাছি যতই আসতে লাগলাম, বিশীর্ণ, বুভুক্ষু, নিরুপায় লোকের ভিড় ততই বাড়তে লাগল। গ্রীষ্মকালের কাঠফাটা রোদে, নিরাশার মরুভূমিতে, বলির পাঁঠার মত উদাস দৃষ্টি নিয়ে সকলে অপেক্ষা করছে।

আমার অসহ্য বোধ হ'ল। আমি মান্নুকে হাত ধ'রে সজোরে টানতে টানতে স্ত্রীকে বললাম, লক্ষ্মীটি, একটু পা চালিয়ে চল, আর তো এসে পড়েছি।

স্ত্রী ভয়বিহ্বল হ'য়ে চারিদিকে চাইছিলেন। আমার কথায় তিনি একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমাকে তুমি মাপ কর, আমি, আমি এতটা বুঝতে পারিনি, চল, চল আমরা ফিরে যাই।

মান্নু ছলছল চোখে ব'লে উঠল, তুমি মা-র কথা শুন না বাবা, এখানে থাকলে আমরা ভাত খেতে পাব না। মা এখানে কিছু খায় না, শুধু উপোস করে!

স্ত্রীকে আমি বললাম, ভয় কি, আমরা তো তিনটি প্রাণী, কলকাতায় গিয়ে একটা কিছু জুটিয়ে নেবো, আমাদের দিব্যি চ'লে যাবে। তুমি একটু পা চালিয়ে চল।

আমি আর পারছি না।

পারবে পারবে, ওই দেখ না, স্টেসন দেখা যাচ্ছে। ভিড় দেখে ভয়

পেয়ো না, আমি দেখো না তোমাদের নিয়ে কিরকমভাবে গাড়িতে উঠি।
স্ত্রী আপ্রাণশক্তিতে পা চালাতে লাগলেন। মান্নু মরিবাঁচি ক'রে চলতে চলতে হেসে আমায় বলতে লাগল, তুমি গিয়েই কিন্তু চাল নিয়ে আসবে বাবা, একটুও দেরি করবে না!
না, একটুও দেরি করব না, কিন্তু তুমি আবার যেখানে সেখানে হাসছ!
স্ত্রীর দেখলাম পা দুটো দুমড়ে দুমড়ে আসছে। আমি সহানুভূতির সঙ্গে ব'লে উঠলাম, চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, না? মনে আর একটু জোর আন!
তুমি মান্নুকে কোলে নাও, ও বড্ড হাঁফাচ্ছে!
সত্যি, মান্নু খুব হাঁফাচ্ছিল। আমি মান্নুকে কোলে নিতে গেলে, মান্নু হেসে বললে, আমি ঠিক হাঁটতে পারব বাবা, আমাকে কোলে নিলে তুমি জোরে হাঁটতে পারবে না।
তুমি আবার হাসছ!
মান্নু হঠাৎ আঁতকে উঠে ব'লে উঠল, বাবা, মা প'ড়ে যাচ্ছে!
আমি তড়িৎগতিতে ঘুরে স্ত্রীকে জাপটে ধরলাম। স্ত্রী বললেন, ওগো আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমার মাথা ঘুরছে, আমাকে বসিয়ে দাও!
বসবে? বসলে কিন্তু আর উঠতে পারবে না। বরং আমার কাঁধের ওপর মাথাটা রেখে একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক, এক্ষুণি সব সেরে যাবে। আর একটুখানি আছে।
অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর স্ত্রী দু এক পা ক'রে চলতে শুরু করলেন। স্টেসনের সিঁড়ির কাছাকাছি এসে আমি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। সিঁড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে কোথাও তিল ধারণের স্থানটুকু পর্যন্ত ছিল না। স্টেসনটা লোকে লোকারণ্য।
আমি মান্নুকে কোলে নিয়ে স্ত্রীর একখানি হাত বজ্রমুষ্টিতে ধ'রে

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর কি হ'ল আর আমি জানি না। হুঁশ এল আমার নিজের কথায়, আমি তখন স্ত্রীকে বলছি, এই দেখ, আমরা স্টেসনের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, এইবার কলকাতায় গিয়ে পৌঁছুলুম ব'লে।

এই সব কথা বলতে বলতে আমি ভিড় ঠেলে অতি কষ্টে স্টেসনের এক কোণে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মানুকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে স্ত্রীর হাত ছেড়ে দিতে, তিনি ধপ ক'রে ব'সে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ বুঁজে এল।

আমি তাড়াতাড়ি তাঁর গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি, চোখ বুজলে যে? শরীরটা খুব খারাপ ঠেকছে?

স্ত্রী আমার দিকে চেয়ে অতি কাতরতার সঙ্গে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, আমার, আমার দম আটকে আসছে, আমি চোখে ধোঁয়া দেখছি, আমি আর পারছি না!

আমি তাড়াতাড়ি কাপড়ের কোঁচা দিয়ে স্ত্রীকে বাতাস করতে লাগলাম। মানু কিন্তু তার মা-র এ অবস্থা দেখে কাতর হ'ল না, মা-র মাথায় হাত বুলতে বুলতে বলতে লাগল, তুমি কিছু ভেবো না মা, কলকাতায় পৌঁছে ভাত খেলে দেখবে, তোমার সব সেরে গেছে। আমরা তো এক্ষুণি কলকাতায় পৌঁছুব, না বাবা?

হ্যাঁ।

'হ্যাঁ' বলার সঙ্গে সঙ্গে মানুর দিকে একবার ভাল ক'রে আমার চোখ পড়ল, দেখলাম তার অতি ক্লিষ্ট, অতি শীর্ণ মুখখানি হাসি মাখা!

আমি অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলাম, এর এত কষ্টেও হাসি আসে কি ক'রে!

স্টেসনের মরা প্রাণে হঠাৎ হইহই-এর জোয়ার এল। স্ত্রী আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে হাঁফাতে হাঁফাতে জিজ্ঞাসা করলেন, ওগো, কি হয়েছে, সকলে

চিৎকার করছে কেন ?

সিগনাল পড়েছে, কলকাতায় যাবার গাড়ি আসছে।

মান্নু খুব হেসে ব'লে উঠল, মা তুমি উঠে পড়, এইবার আমরা কলকাতায় গিয়ে অনেক, অনেক ভাত খাব ! তুমি উঠে পড় মা !

এই সব কথা ব'লে মান্নু সজোরে তার মা-র হাত ধ'রে টানতে গিয়ে অসম্ভব হাঁফাতে লাগল। স্ত্রী সবিশেষ উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন, তুমি মান্নুকে শিগগির কোলে কর, আমাকে হাত ধ'রে তোল !

আমি বললাম, অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন, গাড়ি আসুক !

ওগো, তুমি বুঝছ না, আমি উঠতে উঠতে যদি গাড়ি চ'লে যায় ! আমাকে ধর, আমাকে ধ'রে তোল ! জানি, আমার জন্যে তুমি কত কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু আমি, আমি কি করব বল ! আমাকে ধ'রে তোল, ওই বাঁশি বেজে উঠল, আমাকে ধ'রে তোল, আর দেরি ক'রো না, গাড়ি চ'লে যাবে, ওগো, গাড়ি যে চ'লে যাবে !

আমি মান্নুকে কোলে ক'রে স্ত্রীকে টেনে তুললাম। মান্নুর কি যে ফুর্তি ! সে একমুখ হেসে ঘাড় দোলাতে দোলাতে বলতে লাগল, এইবার আমরা কলকাতায় যাব, এইবার আমরা কলকাতায় যাব।

ট্রেন স্টেসনে ঢুকে পড়েছে। আমি উত্তেজিত হ'য়ে স্ত্রীকে ব'লে উঠলাম, আমার হাত তুমি খুব জোরে চেপে ধর, যেন আলগা হ'য়ে না যায়, নইলে ভিড়ে কোথায় চ'লে যাবে !

আমি মরিয়া হ'য়ে ভিড়ের মধ্যে ওদের নিয়ে ঢুকে পড়লাম। মান্নুর লাগছে কি না দেখবার জন্যে ওর দিকে একবার তাকাতে গিয়ে দেখি, ও হাসছে ! আমি চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম, তুমি হেসো না মান্নু, আমাকে খুব জোরে জড়িয়ে ধ'রে থাক, নইলে ছিটকে কোথায় প'ড়ে যাবে, বুঝেছ ?

প্রবল জনস্রোতের প্রচণ্ড এক ধাক্কা এল, আমি ওদের নিয়ে ছিটকে

পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। কিন্তু কত লোক ছিটকে প'ড়ে গেল, পায়ের তলায় চেপটে গিয়ে গোঙাতে লাগল। গোঙানির আওয়াজ আমায় পাগল ক'রে তুললে, কোথা থেকে আমার শরীরে অযুত শক্তি এল, আমি কামরার দিকে ধাবমান হলাম। অনেক ঠেলাঠেলি, ধ্বস্তাধ্বস্তির পর একটি কামরার দরজার সামনে উপস্থিত হলাম। দরজা ঠেলে খোলে কার সাধ্যি! আমি স্ত্রীকে জোরে বললাম, আমি নীচু হচ্ছি, আমার কাঁধের ওপর পা রেখে দরজার জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়! আমি মানুকে নিয়ে উঠছি।

আমি পারব না, আমি পারব না!

মানুকে কোলে ক'রে নীচু হ'য়ে বসতে বসতে আমি বিকট চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম, উঠে পড় বলছি!

ভীষণ চাপে আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগল। স্ত্রী কাঁধে পা দিতে, আমি ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর মানুকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে এক হাতে ধ'রে থেকে, ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ভেতরে ঢুকতে লাগলাম। খানিকটা ঢুকে দেখি, স্ত্রী ভয়ানক হাঁফাচ্ছেন। আমিও অত্যন্ত হাঁফাতে হাঁফাতে স্ত্রীকে বললাম, মানুকে একটু ধর তো, আমি ঢুকে পড়ি।

স্ত্রী মানুকে কোন রকমে ধরলেন, আমি অতি কষ্টে আধ মরা হ'য়ে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে দেখি, মানু চোখ বুঁজে হাসছে! আমি ভীষণ চ'টে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, মানু, আমি না তোমায় যখন তখন হাসতে বারণ করেছি! তুমি আবার হাসছ!

মানুর ঘাড়টা হঠাৎ লটকে পড়ল। আমি সভয়ে মানুকে দু হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে ডাকতে লাগলাম, মানু, মানু, মানু মা!

কে সাড়া দেবে? মানু আমাদের হাসতে হাসতে কখন চ'লে গেছে!

লোকটি আমার দিকে এবার ভাল ক'রে চেয়ে হাসতে হাসতে বলতে

লাগল, জানেন, মাহু আমাদের কখন হাসতে হাসতে চ'লে গেছে! আর যাবে না! কচি বাঁশ, তেল তো তেমন খায় নি, কত সহ্ করবে! আপনিই বলুন, কত সহ্ করবে!

শ্রীরামপুরে ট্রেন এসে থামল। লোকটি জোরে হাসতে হাসতে বলতে লাগল, কত সহ্ করবে, কচি বাঁশ, তেল তো তেমন খায় নি, কি বলেন? কত সহ্ করবে!

তারপর সে হোহো ক'রে প্রচণ্ড ধরনের হেসে উঠে, গাড়ির দরজা খুলে নামতে নামতে ব'লে উঠল, যাই, শেওড়াফুলি এসেছে, এবার নেমে যাই, নমস্কার, নমস্কার।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। একটু পরে সামলে নিয়ে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম, শুনছেন, এ শেওড়াফুলি নয়, শ্রীরামপুর!

লোকটি তখন স্টেসনে নেমে প'ড়ে কিছুদুর এগিয়ে পড়েছে। সে আমার চিৎকারে ঘুরে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকেই চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল, ও একই কথা, শ্রীরামপুরও যা, শেওড়াফুলিও তাই, বাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিরনব্বই। আচ্ছা, আচ্ছা, নমস্কার, নমস্কার, হা-হা-হা-হা—

লোকটি হাত উঁচু ক'রে নমস্কার জানাতে জানাতে আবার চলতে শুরু ক'রে দিলে।

বাবলু

১

রথযাত্রার আগের দিন। পাঁচ বছরের বাবলু সারাদিন সকলকে বকিয়ে বকিয়ে অস্থির ক'রে তুলেছে। তার প্রধান জিজ্ঞাসা, কখন রথ কেনা হবে?

ছোটমামা কলেজ থেকে ফিরতেই বাবলু দৌড়ে গিয়ে তাকে দরজার কাছে ধ'রে অস্থির হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, বল না ছোট, কখন রথ কিনে দেবে?

ছোটমামা হেসে উত্তর করলে, তোমাকে তো বলেছি, কাল সকালে কিনে দেবো।

না আজই কিনে দাও।

এখন রথ কোথায় পাব? কাল সকালে যখন মেলায় বিক্রি করতে আসবে কিনে দেবো।

বাবলু ছোটমামার কোঁচা ধ'রে টানতে টানতে ব'লে উঠল, না এক্ষুণি কিনে দিতে হবে ছোট।

ছোটমামা হেসে উঠে বললে, আরে ছাড়্ ছাড়্, বলছি তো কাল সকালেই কিনে দেবো।

বাবলু কিন্তু নাছোড়বান্দা। ছোটমামা বলতে লাগল, কাল শুধু তোমায় রথ কিনে দেবো না, তেতলা রথ কিনে দেবো। দেখবে কত

বড় রথ, দু ঘোড়ার রথ, সামনে সারথি ব'সে হাতে চাবুক নিয়ে কি রকম জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে রথ চালাচ্ছে!

ছোটমামার কথাগুলো শুনতে শুনতে বাবলুর কোঁচা টানা আপনি বন্ধ হ'য়ে গেল। সে প্রায় এক নিশ্বাসে প্রশ্ন ক'রে উঠল, জগন্নাথ কিনে দেবে? কটা কিনে দেবে ছোট? একশটা কিন্তু কিনে দিতে হবে। ফুলের মালা কিনে দেবে? গাছের পাতা কিনে দেবে? কে সাজাবে ছোট? কি ক'রে টানব? যদি টানতে গিয়ে রথ ভেঙ্গে যায়?

ভাঙ্গবে কেন? আস্তে আস্তে চালাবে।

আস্তে আস্তে চালালে বুঝি ভাঙ্গে না ছোট?

না। তা হ'লে চল আমরা ওপরে যাই।

বাবলু ছোটমামার কোঁচা ধ'রেই ওপরে এল। সে কিন্তু নীরবে এল না, বকবক করতে করতেই এল।

ওপরে এসেই কর্তাদাদুকে তার ঘরে দেখতে পেয়ে সে সানন্দে ব'লে উঠল, কর্তাদাদু, কর্তাদাদু, ছোট আমায় কাল সকালে রথ কিনে দেবে বলেছে, ফুল, মালা, বাতি সব কিনে দেবে বলেছে।

আশি বছরের কর্তাদাদুর অতি তুচ্ছ কারণেই আজ কাল ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। বাবলুর সঙ্গে তাঁর সাপে নেউলে সম্পর্ক। তার ওপর এই রথ কেনা নিয়ে আজ দুপুরে বাবলুর সঙ্গে তাঁর দু চার বার বেশ কথা কাটাকাটি হ'য়ে গেছে, কাজেই এখন বাবলু যেই রথ কেনার কথা বললে, তিনি দপ ক'রে জ্ব'লে উঠে বললেন, তা আমায় বলছ কেন! কিনে দেয় দেবে!

আমি কিন্তু তোমায় একবারও রথ টানতে দেবো না।

রথ টানতে আমার ব'য়ে গেছে!

বাবলু এ কথার কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ মহা ফুর্তির সঙ্গে একটু চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, জানলে কর্তাদাদু, ছোট আমায় একশটা জগন্নাথ

কিনে দেবে বলেছে !

কর্তাদাদু চিৎকার ক'রে উত্তর দিলেন, তাতে আমার কি ! ফের তুমি বকবক করতে শুরু করেছ ! আমার ঘর থেকে তুমি চ'লে যাও, এক্ষুণি চ'লে যাও।

বাবলু দুষ্টুমির হাসির সঙ্গে ব'লে উঠল, যাব না।

যাও বলছি।

বাবলু নাচতে নাচতে বলতে লাগল, যাব না, যাব না।

যাবে না, দাঁড়াও !

কর্তাদাদু লাঠি ধ'রে উঠে পড়লেন। বাবলুও ছুটে পালাতে পালাতে বলতে লাগল, যাব না, যাব না।

তবে রে !

কর্তাদাদু মহা রেগে বাবলুকে ধরবার জন্যে তার প্রতি ধাবমান হলেন। বাবলুও 'যাব না, যাব না' বলতে বলতে চতুষ্কোণ বারান্দার ও-কোণে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। কর্তাদাদু তাড়া করলেন, বাবলুও ছুটতে লাগল। তারপর চলল খানিকক্ষণ ধ'রে বারান্দার চারিধারে ছুটোছুটি। দমের লড়াইএ কর্তাদাদু পরাজিত হলেন। তিনি থেমে প'ড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ভয়ানক রেগে ব'লে উঠলেন, তোমার রথ চালানো আমি বের ক'রে দেবো, একশটা জগন্নাথ কেনা আমি ঘুচিয়ে দেবো !

কর্তাদাদুর শাসানোতে বাবলু মোটেই ভয় পেলে না। সে বরং বারান্দার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে দুষ্টুমির হাসির সঙ্গে নাচতে নাচতে আবার বলতে লাগল, কর্তাদাদু, আমি যাব না, যাব না।

নিরুপায় কর্তাদাদু রাগে লাঠিটা ঠকঠক করতে করতে নিজের ঘরের দিকে যেতে লাগলেন। বাবলু হেসে হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, কর্তাদাদু ধরতে পারলে না, কর্তাদাদু দুয়ো, কর্তাদাদু দুয়ো !

কর্তাদাদু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বাবলুর দিকে শ্যেন দৃষ্টি হেনে ব'লে

উঠলেন, হুয়ো দেওয়া তোমার আমি বের করছি, জগন্নাথ কেনা, রথ চালানো আমি রসাতলে পাঠাচ্ছি!

কর্তাদাতুর শ্যেন দৃষ্টি কিন্তু বাবলুকে এবার ভয় পাইয়ে দিলে। সে কর্তাদাতুর দিকে সভয়ে চেয়ে ব'লে উঠল, আর করব না কর্তাদাতু!

যাও!

জীবনে করব না কর্তাদাতু!

কর্তাদাতু ততক্ষণ ঘরে ঢুকে পড়েছেন, তিনি সেখান থেকেই চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, তোমার বাজে কথা আমি শুনতে চাই না!

বাবলু চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়ল। হঠাৎ সে দৌড়ে তেতলায় ছোটমামার কাছে গিয়ে তার একখানা হাত ধ'রে টানতে টানতে বলতে লাগল, কাল নয় ছোট, আজ, আজই রথ কিনে দেবে চল!

এই তো তোমার সঙ্গে কথা হ'ল বাবলু, কাল রথ কেনা হবে!

না কাল নয়, আজ এক্ষুণি।

তুমি কথার খেলাপ করছ বাবলু!

না ছোট, আজ।

ছোটমামা বাবলুকে একটু আদর ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ কি হ'ল রে বাবলু?

কর্তাদাতু রথ, জগন্নাথ কিনতে দেবে না বলেছে!

তুমি কি করেছ?

আমি দুষ্টুমি করেছি।

কেন করলে?

বা রে, কর্তাদাতু কেন আমায় বললে, তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও!

একটু বেশী দুষ্টুমি ক'রে ফেলেছ বাবলু, যাই হ'ক, কাল রথ কিনে দেবো ব'লে যখন তোমায় একবার কথা আমি দিয়েছি, তুমি জানবে, সে কথার

নড়চড় কখনো হবে না। কালই তোমাকে আমি রথ কিনে দেবো। এখন যাও, খেলা কর গে।

ছোটমামার কথায় বাবলুর মন ভিজল না। সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, দুষ্টুমি আর কক্ষনো করব না ছোট, কিন্তু তুমি এক্ষুণি রথ কিনে দেবে চল, চল না ছোট!

এই ব'লে সে ছোটমামার ডান হাতখানি ধ'রে সজোরে টানতে লাগল। ছোটমামা তখন বেরবে ব'লে তোড়জোড় করছিল, এবার একটু বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠল, বলছি না, কাল উঠেই কিনে দেবো!

বাবলু মহা জেদের সঙ্গে ব'লে উঠল, আজ তোমাকে কিনে দিতেই হবে।

ছোটমামা বিশেষ বিরক্ত হ'য়ে ধমক দিয়ে ব'লে উঠল, যাও এখান থেকে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে! এসে পর্যন্ত একটু স্থির হ'য়ে কিছু করব তারও উপায় নেই!

ছোটমামা তার ডান হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বাবলুকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিলে। বাবলুর ভয়ানক অভিমান হ'ল। সে ধীরে ধীরে ছাদে গিয়ে এক কোণে মুখখানা গোঁজ ক'রে ব'সে রইল।

২

রাত্রি তখন সাড়ে দশটা। বাবলু অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছে। নীচে দরজা খোলার ঢকাস ক'রে আওয়াজ হতেই হঠাৎ বাবলু ধড়মড় ক'রে উঠে প'ড়ে একেবারে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে ডেকে উঠল, দাদু, দাদু?

দাদু নীচে থেকে সাড়া দিলেন। ছোটমামা আশ্চর্য হ'য়ে ব'লে উঠল, এতক্ষণ ও তা হ'লে মটকা মেরে পড়েছিল!

বাবলু দাদুর সাড়া পেয়ে অন্ধকারেই নীচে নেমে গিয়ে বললে, আমাকে

কেউ রথ কিনে দিচ্ছে না, দাদু ! কর্তাদাদু রথ, জগন্নাথ কিছুই কিনতে দেবে না বলেছে !

তুমি বুঝি খুব লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করেছিলে ?

হ্যাঁ।

একটু কম ক'রে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে হয় বাবলু। যাই হ'ক তোমার কিছু ভাববার নেই। আমি কাল সকালে কর্তাদাদুকে বুঝিয়ে তোমাকে রথ কিনে দেবো।

না, আজ কিনে দাও দাদু।

আজ কি ক'রে হবে বাবলু? দেখছ তো কত রাত হ'য়ে গেছে, এখন কিনতে গেলে অন্ধকারে ভাল রথ বুঝতে পারব কি ক'রে, একটা ভাঙ্গা রথ হয়তো কিনে ফেলব। তার চেয়ে কাল ভোরে উঠে তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে গিয়ে রথ কিনে নিয়ে আসব। কি সুন্দর হবে বল তো !

বাবলুও মহানন্দে ব'লে উঠল, আমিও তা হ'লে যাব দাদু ?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু খুব বড় রথ কিনতে হবে দাদু !

নিশ্চয়ই কিনতে হবে।

আর একশটা জগন্নাথ কিনতে হবে।

অত জগন্নাথ কি হবে ! রথে জায়গা হবে কেন ?

তবে কটা জগন্নাথ কিনব দাদু ?

একটা জগন্নাথ। তবে দেখ, একটা বলরাম আর একটা সুভদ্রাও কিনতে হবে।

জগন্নাথ তো ঠাকুর ? বলরাম, সুভদ্রা কে দাদু ?

বলরাম সুভদ্রাও ঠাকুর। বলরাম হচ্ছে জগন্নাথের দাদা আর সুভদ্রা বোন।

ও, কিন্তু দাদু, রথ টানতে গিয়ে যদি রথ ভেঙ্গে যায় ?

ভেঙ্গে যায় আর একটা কিনে আনলেই চলবে। তবে ভাঙ্গবে কেন বাবলু ? আস্তে আস্তে রথ টানলে রথ কি ক'রে ভাঙ্গতে পারে ? তুমিই নয় একবার ভেবে দেখ ?

ভাঙ্গতে পারে না দাদু।

তবে ?

কিন্তু যদি কোন রকমে ভেঙ্গে যায়, তুমি তো থাকবে না দাদু, ছোটকে ব'লে যেয়ো, ছোট যেন তক্ষুনি ছুটে গিয়ে আর একটা রথ কিনে নিয়ে আসে।

ব'লে তো যেতেই হবে।

সে রাত্রে আনন্দাতিশয্যে বাবলুর ঘুম সহজে আসতে চাইল না।

৩

পরদিন অতি ভোরে উঠেই বাবলু নিদ্রারত দাদুকে ঠেলতে ঠেলতে ডাকতে লাগল, দাদু ওঠ, রথ কিনতে যাবে চল !

হ্যাঁ, উঠি।

দাদু পাশ ফিরে শুলেন। বাবলু ছটফট করতে করতে সজোরে দাদুকে ধাক্কা দিতে দিতে বলতে লাগল, কই তুমি উঠছ !

হ্যাঁ, এই উঠি।

দাদুকে তখনো চোখ বুঁজে প'ড়ে থাকতে দেখে বাবলু কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে ব'লে উঠল, ওঠ না দাদু, রথ যে ফুরিয়ে যাবে, তখন কি ক'রে কিনবে ?

অগত্যা দাদুকে উঠতে হ'ল। বাবলু দৌড়ে গিয়ে এক ঘটি জল নিয়ে এসে দাদুকে বললে, নাও, মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি চল, নইলে সব ফুরিয়ে যাবে।

ফুরিয়ে গেলেই হ'ল। তোমাকে আমি রথের আড়তে নিয়ে যাব বাবলু, দেখবে সেখানে কত সুন্দর সুন্দর রথ আছে।

বাবলু ভীষণ ছটফটানির সঙ্গে ব'লে উঠল, না, তুমি তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নাও।

বাবলুর তেতলা রথ এল। দুটি জগন্নাথ এল, একটির নামকরণ হ'ল জগন্নাথ, অপরটির বলরাম। একটি মেয়ে পুতুল এল, সেই হ'ল সুভদ্রা।

বাবলুর সে কী ফুর্তি! সকলকে শাসিয়ে সে বলতে লাগল, খবরদার, আমার কিছুতে কেউ হাত দেবে না কিন্তু!

দাদু নীচে স্নান করছিলেন। বাবলু ওপরের বারান্দা থেকে চিৎকার ক'রে ডেকে উঠল, দাদু, তুমি কোথায়?

আমি নীচে চান করছি।

জগন্নাথ রথের কোন তলায় থাকবে দাদু?

জগন্নাথ? তা তুমি ঠিক কর না।

আমি ঠিক করতে পারছি না দাদু!

কেন?

আমি কি রকম হ'য়ে যাচ্ছি। তুমি বল না দাদু?

দোতলাতেই সবাইকে বসাও। মধ্যিখানে সুভদ্রাকে রাখ, তার ডানদিকে বসাও বলরামকে আর বাঁদিকে জগন্নাথকে।

ডান দিকে? আমি যে হাতে খাই সেই দিকে?

এই ব'লে বাবলু তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে দেখালে।

দাদু হাসি চেপে ব'লে উঠলেন, হ্যাঁ।

বাবলু আর দাঁড়াল না, তীরের মত ছুটে চ'লে গেল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তীর বেগে ফিরে এসে মহা দুশ্চিন্তার সঙ্গে ডেকে উঠল, দাদু শুনছ?

কি হ'ল !

ভাল হ'ল না দাছু।

কেন হে ?

এক সঙ্গে ভাল মানাবে না।

তবে কি করতে চাও ?

সুভদ্রা ওপরে থাকবে, দোতলায় জগন্নাথ আর একতলায় বলরাম।

কেন বল তো ?

সুভদ্রা তো মেয়ে ছেলে, আর মেয়ে ছেলে তো মা হয়, মা সকলের ওপরেই থাকুক দাছু।

বেশ। কিন্তু বলরাম একতলায় থাকবে কেন বাবলু ?

বলরাম ভাল নয় দাছু, বড্ড মোটা।

যে পুতুলটির বলরাম নামকরণ করা হয়েছে, সত্যি সেটি জগন্নাথের চেয়ে ঢের বেশী মোটা। দাছু অতি কষ্টে হাসি চেপে ব'লে উঠলেন, তা বাবলু বলরাম তো মোটা হবেই, বলরাম যে জগন্নাথের দাদা।

না দাছু, বলরাম ভাল নয়, বিশ্রী। ওটা তুমি ফেরত দিয়ে এসে আর একটা জগন্নাথ নিয়ে এস।

দাছু প্রমাদ গুণলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, না না বাবলু, তুমি যা ঠিক করেছ সেই ভাল, বলরামকে একতলায় বসাও।

না, তুমি ফেরত দিয়ে এস।

এটা কি বাবলুর মত কথা হ'ল ! বলরাম নীচে থাকলে কি সুবিধে হবে জান ?

কি ?

বলরাম মোটাসোটা তো, নীচে থাকলে কেউ ভয়ে রথে উঠতে চাইবে না। বলরাম হচ্ছে তোমাদের স্কুলের বাহাছুর সিং। বাহাছুর সিং যখন তোমাদের স্কুলের গেটে ব'সে থাকে, ছুষ্টু ছেলেরা কি কেউ ভেতরে

ঢুকতে পারে!

বাবলু দাদুর কথায় খুব খুশী হ'য়ে নেচে উঠে হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল, তুমি সুন্দর কথা বলেছ দাদু, তুমি সুন্দর কথা বলেছ। বলরাম বাহাদুর সিং হবে।

বাবলু আর দাঁড়াল না, এক ছুট দিলে।

দাদু স্নান সেরে ওপরে উঠে দেখেন, ছোটমামার সঙ্গে বাবলুর ঝগড়া চলেছে। দাদুকে দেখতে পেয়েই বাবলু ব'লে উঠল, দেখ না দাদু, ছোট এমন পাতা দিয়ে সাজাচ্ছে জগন্নাথের মুখ ঢেকে যাচ্ছে।

সে কি!

বাবলু মিনতি ক'রে ব'লে উঠল, তুমি একবার এস না দাদু!

দাদু এলে, বাবলু ছোটমামাকে শাসনের সুরে বললে, ছোট, তুমি এক্ষুণি চ'লে যাও।

ছোটমামা ছল ক'রে ইতস্তত করতে বাবলু গর্জে ব'লে উঠল, এক্ষুণি যাও বলছি!

রথ সাজানো হ'য়ে গেল। বাবলু রথের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু ক'রে দিলে।

দাদু ব'লে উঠলেন, কি হ'ল বাবলু, অত নাচ্ছ কেন?

বাবলু নাচ থামিয়ে মহানন্দে ব'লে উঠল, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে কি না!

তাই না কি!

হ্যাঁ।

তা হ'লে নাচতে হবে বই কি।

এই ব'লে দাদু ও-ঘরে চ'লে যাচ্ছিলেন। বাবলু হঠাৎ চিৎকার ক'রে ডেকে উঠল, দাদু শোন?

দাদু ফিরে এসে বললেন, আবার কি হ'ল!

তোমার কানে কানে একটা কথা বলব, দাদু।

দাদু হেঁট হ'তে বাবলু কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললে, আমি কি কর্তাদাদুকে রথ টানতে দেবো ?

দেওয়া তো উচিত বাবলু।

কিন্তু কর্তাদাদু যদি আমার রথ ভেঙে দেয় ?

ধেৎ, কর্তাদাদু তোমায় কত ভালবাসেন তুমি বুঝি বুঝতে পার না ?

তবে কর্তাদাদু আমায় তাড়া করে কেন ?

তুমি দুষ্টুমি কর কেন ?

আমি যদি দুষ্টুমি না করি ?

কর্তাদাদুও তোমায় তাড়া করবেন না।

তুমি ঠিক বলছ দাদু ?

হ্যাঁ হে হ্যাঁ।

তা হ'লে কর্তাদাদু রথ টানুক, কি বল দাদু ?

নিশ্চয়ই।

বাবলু আর কোন কথা না ব'লে রথের সামনে গিয়ে তড়াক তড়াক ক'রে লাফাতে লাগল।

৪

দাদু রাত্রে আটটা নাগাত ফিরে এসে দেখেন, বাড়িতে হুলস্থুল প'ড়ে গেছে। ছোটমামা রথ হাতে ক'রে নীচে থেকে বাবলুর নাম ধ'রে অনবরত ডাকছে, ওপরে বড়মামার তর্জন গর্জন শোনা যাচ্ছে।

দাদু আশ্চর্য হ'য়ে ছোটমামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে, ব্যাপার কি! এত গোলমাল কেন ?

বাবলুকে কত ক'রে ডাকছি, বাবলু কিছুতেই রথ টানবে না!

রথ টানবে না! সে কি!

বড্ড অসভ্য হয়েছে। রথ নিয়ে রাস্তায় গিয়েছিল, টানতে গিয়ে রথ একবার হেলে প'ড়ে যেতেই হঠাৎ চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠে ব'লে উঠল, 'ছোট আমি রথ টানব না, ছোট আমি রথ টানব না।' এই বলতে বলতে সে ছুটে ওপরে পালিয়ে গেল কাকা! সেই থেকে কত ডাকাডাকি করছি কিছুতেই আসছে না! তুমি কিন্তু ওকে বড্ড আদর দিয়ে ফেলেছ!

দাদু কিছু বললেন না, ওপরে উঠে দূর থেকে দেখেন, বড়মামা রীতিমত চ'টে গিয়ে বাবলুকে বলছে, তোমায় আমি অনেক বুঝিয়েছি আর বোঝাব না। ছোট ডাকছে, এক্ষুণি নীচে যাও।

বাবলু সভয়ে ব'লে উঠল, আমি রথ টানব না, বড়!

বড়মামা ধমক দিয়ে বললে, কেন টানবে না?

বাবলু চুপ ক'রে রইল। ছোটমামা নীচে থেকে বাবলুকে ঘন ঘন ডাকতে লাগল। বড়মামা ছোটমামার ঘন ঘন ডাকে অতিষ্ঠ হ'য়ে বললে, যাও এক্ষুণি নীচে যাও। দু দিন ধ'রে রথ রথ ক'রে তো লোকের হাড় মাস চিবিয়ে খেলে, এখন আবার বলা হচ্ছে রথ টানব না! আবার কিছুক্ষণ বাদেই বলবে, রথ টানব! আমরা সব কাজ ফেলে রেখে এই কর্ম করি আর কি, যাও নীচে যাও!

বাবলু কাঁচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। বড়মামা ভীষণ চ'টে গিয়ে বললে, আমি বলছি যাও!

তবুও বাবলুকে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড়মামা মহা রেগে ব'লে উঠল, অসভ্যর ধাড়ী কোথাকার, কথা শোনা হচ্ছে না, তোমার একগুঁয়েমি আমি ভাঙ্গছি!

বড়মামা বাবলুকে এক ঘা চড় কষিয়ে দিলে। ও-ঘর থেকে কর্ত্তাদাদু ব'লে উঠলেন, কি ছেলেই মানুষ হচ্ছে! বছরকার দিন রথ টানবে, তা নয়!

বাবলু চড় খেয়ে আর্তনাদ ক'রে ব'লে উঠল, আমি রথ টানব না বড়, আমি কোনদিন রথ টানব বলব না !

বাবলুর আর্তনাদে বড়মামা চমকে উঠল। তার অনুশোচনায় বুক ভ'রে গেল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওপর থেকে ছোটমামাকে বললে, ও দেখছি রথ টানবে না, রথটা ওপরে রেখে তুই বরং যা।

দাদুকে দেখতে পেয়ে বড়মামা ব'লে উঠল, বাবলু রথ কিছুতেই টানছে না কাকা, ছোট কত বোঝালে, আমি কত বললাম।

তাই তো দেখছি।

দাদু আর দাঁড়ালেন না, ভেতরে চ'লে গেলেন। এধারে ছোটমামা রথ ওপরে রাখতে এলে কর্তাদাদুর সেটা মোটেই ভাল লাগল না। তিনি বিরক্তির সঙ্গে ব'লে উঠলেন, আঃ, রথটা আবার ওপরে নিয়ে এলে কেন, রথটা কি তোমাদের গায়ে কামড়াচ্ছিল! আরে বাপু, ছেলেমানুষ একটা বায়না ধরেছে, তা ব'লে কি এ বায়না ওর চিরকাল থাকবে! তোমরা দেখছি ওকে রথ টানতে কিছুতেই দিতে চাও না।

কিন্তু ও যে কিছুতে রথ টানতে চাচ্ছে না!

তবে আর কি, ওই ছুতো ধ'রে রথটা ওপরে ফেলে দিয়ে যে যার বন্ধুবর্গ নিয়ে হইহই কর গে!

ছোটমামা মুশকিলে পড়ল। মনে মনে ভাবলে, এ এক ভাল বিপদে পড়া গেল। বাবলু গোলমাল করলে বলবেন, তোর রথটানা ঘুচিয়ে দেবো, আবার রথ না টানতে চাইলে বলবেন, তোকে রথ টানতেই হবে। এ যে দেখছি তাতও সয় না, বাতও সয় না!

ছোটমামা মুখে কর্তাদাদুকে বললে, তা হ'লে কি ক'রব বলুন?

কি করবে তা আমি কি ক'রে বলব, ঘটে বুদ্ধি নেই! একটা ছোট ছেলে, তাকে সামলাতে পারছ না!

ছোটমামাকে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কর্তাদাদু বেশ
ব'লে উঠলেন, বলি, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, কিছু যদি করবার
সামর্থ্য না থাকে, রথটা মাঝের ঘরে রেখে চ'লে যাও !
ছোটমামা বিরক্ত হ'য়ে রথটা মাঝের ঘরে রেখে চ'লে গেল ।

৫

দাদুকে ঘরে ঢুকতে দেখেও বাবলু কিন্তু আজ একটুও নড়ল না। শুধু ফুঁপিয়ে কাঁদাটা তার একটু বেড়ে গেল। দাদু কাপড়জামা ছাড়তে ছাড়তে এই চিন্তাই করতে লাগলেন, যে রথ রথ ক'রে মানুষকে একদণ্ডও তিষ্ঠতে দিচ্ছিল না, সকলকে পাগল ক'রে তুলেছিল, রথ কেনার পর যার আর আনন্দ ধরছিল না, তার এ অভাবনীয় পরিবর্তন কি ক'রে হ'ল ?
কাপড় জামা ছেড়ে দাদু বাবলুকে ডাকলেন. বাবলু কিন্তু এল না। অগত্যা তিনি বাবলুর কাছে গিয়ে তার একখানা হাত ধ'রে হাসিমুখে আদরের সঙ্গে বললেন, চল, ও-ঘরে চল, একটা মজার গল্প শুনবে চল। বাবলু মাথা নীচু ক'রেই বেঁকে দাঁড়িয়ে রইল। দাদু বাবলুকে জোর ক'রে ও-ঘরে নিয়ে এলেন। আসবার সময় বাবলু সজোরে দাদুর পিঠে এক ঘা চড় কষিয়ে দিলে। দাদু শুধু হাসলেন।
বাবলুকে বসিয়ে দাদু ব'লে উঠলেন, আমাকে মারলে তো, এধারে কি মজার ব্যাপার ঘটেছে জান ?
বাবলু কোন আগ্রহ প্রকাশ করলে না, নিরুত্তর রইল।
দাদু হেসে বলতে লাগলেন, ভয়ানক মজার ব্যাপার বাবলু, ভয়ানক মজার ব্যাপার ! জানলে বাবলু, আজকে রাস্তায় একটা মস্ত বড় কুকুর একটা বাচ্চা বেড়ালকে কামড়াতে যাচ্ছিল। বেড়ালটা শরীর ফুলিয়ে ল্যাজ মোটা ক'রে যেই ফোঁস ক'রে উঠল, কুকুরটা একেবারে দে-ছুট।

দাদু হাহা শব্দে হেসে উঠলেন। হাসির সংক্রমন হ'ল, বাবলু এবার হেসে ফেলে সব ভুলে গিয়ে দাদুর একেবারে কাছ ঘেষে ব'সে আগ্রহে ফুটি-ফাটা হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, কুকুরটা বোঁবোঁ শব্দে ছুটে পালাল দাদু ?

হ্যাঁ।

বেড়ালটা ঠিক কত বড় দাদু ?

এক বিঘেত হবে।

একবার মেপে দেখাও না, দাদু ?

দাদু মেপে দেখাতে, বাবলু সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, ওইটুকু বেড়ালের ভয়ে কুকুরটা পালিয়ে গেল !

হ্যাঁ হে।

বেড়ালটা তা হ'লে খুব তেজী বল, তুমি, তুমি নিয়ে এলে না কেন দাদু, আমি পুষতাম ?

গায়ে যে বড্ড ময়লা !

বেড়াল চান ক'রে না দাদু ?

চান করে, তবে রাস্তায় বড্ড ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কি না। আচ্ছা বাবলু, তুমি আজ রথ টানতে গিয়ে রাস্তায় কোন মজার ব্যাপার দেখনি ?

কি ক'রে দেখব ! আমি তো রথ টানছিলাম দাদু, ছোট না, দড়ি ধ'রে এমন জোরে টান দিলে, জগন্নাথ প'ড়ে গেল, আমি পালিয়ে এলাম।

কেন, কেন, পালিয়ে এলে কেন ?

বারে, আমার যে পাপ হবে ?

পাপ হবে ! কেন পাপ হবে ?

তুমি কিচ্ছু জান না দাদু। পাপ হয়, শুধু পাপ হয় না, হাত পা ভেঙ্গে যায়।

তুমি কি ক'রে জানলে ?

আজ দুপুরে না, যখন আমি খুব জোরে জোরে রথ টানছিলাম, ব
তো আমায় বললে, 'তুমি অত জোরে রথ টানছ, দেখবে তোমার কি হয়। তোমার পাপ হবে, জগন্নাথ প'ড়ে ভেঙ্গে গেলে, তোমারও হাত পা ভেঙ্গে যাবে, তুমি খেলতে পারবে না, চলতে পারবে না, সাইকেল চালাতে পারবে না, খেতে পারবে না।' আমি জীবনে আর রথ টানব না দাদু, তুমি ছোটকে, বড়কে একবার ব'লে দিও।

ব'লে দেবো।

দাদু কিন্তু চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়লেন।

এদিকে কর্তাদাদু এতক্ষণ নিজের ঘরে ব'সে আপন মনেই গজর গজর করছিলেন, ছোটমামা তো রথ রেখে তাঁর কর্তব্য শেষ ক'রে গেলেন, আর বড়মামা ছোটমামাকে ওপরে রথ আনতে ব'লে মনের দুঃখে বোধ হয় বনে গেলেন। এদিকে দাদু বাড়ি ফিরে, 'তাই তো দেখছি' ব'লে রাগ ফলিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন, ছেলেটা যে বছরকার দিন রথ টানছে না, সেদিকে তো কারুর হুঁশ নেই! কেন টানছে না দেখ, ভুলিয়ে ভালিয়ে রথটাকে টানাও!

কথাগুলো পাঁচ সাতবার ব'লে তিনি উত্তেজিত হ'য়ে উঠে প'ড়ে, লাঠিটা নিয়ে মাঝের ঘরে ঢুকে প'ড়ে ব'লে উঠলেন, বলি সব শুনছ, একটা দুধের ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বছরকার দিন রথ টানাতে পারছ না, আবার সব মুরোদের বড়াই কর!

তিনি প্রবল উত্তেজনায় মেঝের দিকে না তাকিয়ে চলতে গিয়ে তাঁর লাঠিটা রথের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। রথ উলটে প'ড়ে গেল। শব্দ শুনে ও-ঘর থেকে দাদু, বাবলু ছুটে এল।

কর্তাদাদু একটু স'রে এসে রথের দিকে চাইতে যাবেন এমন সময় দাদুকে সামনে আসতে দেখে তিনি বেশ বিরক্তির সঙ্গে ব'লে উঠলেন, আচ্ছা, তোমরা কী! একটা দুধের ছেলেকে ভুলিয়ে রথ টানতে—

কর্তাদাদুর আর বলা হ'ল না, বাবলু হঠাৎ মহা খুশী হ'য়ে বেশ চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, ছোট, তুমি কোথায়, আমি যে রথ টানব, ছোট, তুমি কোথায় গেলে, কর্তাদাদু জগন্নাথ ভেঙ্গে ফেলেছে তবুও কর্তাদাদুর পা ভেঙ্গে যায় নি, কর্তাদাদু হাঁটতে পারছে! ছোট তুমি কোথায়!

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবলুর অধিনায়কত্বে বাবলুর রথ ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ ক'রে চলতে লাগল।

বোষ্টম-বোষ্টমী

১

তেরশ পঞ্চাশ সালের মাঝামাঝি। দুর্ভিক্ষের তখন ভরা যৌবন। জনাকীর্ণ কলকাতায় গাঁ থেকে হাজারে হাজারে আবালবৃদ্ধবনিতা অন্নের আশায় পাগলের মত ছুটে আসছে। নিধু বোষ্টম ও সারদা বোষ্টমী গাঁ ছেড়ে কলকাতার উপকণ্ঠে এক ডেরায় কোন রকমে একটু জায়গা ক'রে নিতে পেরেছে।

প্রথম দু দিন কাছাকাছি 'নাম' ক'রে তারা একটি পয়সাও ভিক্ষে পেলে না। প্রথম দিন অবশিষ্ট দুমুঠো চিঁড়েয় তাদের কষ্টেস্বষ্টে কাটল। দ্বিতীয় দিন তাদের চলল উপবাস। তৃতীয় দিন তিন মাইল পথ হেঁটে কলকাতার বুকের ওপর এসে তারা মাত্র পেলে চারটে পয়সা। সেদিনও তাদের এক রকম উপবাসেই কাটল।

দিন পনর ধ'রে অর্ধাশনে তাদের শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল, তার ওপর দু দিন অনশনে থাকায় তারা নির্জীব হ'য়ে পড়ল। চতুর্থ দিন বেরবার তাদের সামর্থ্য ছিল না, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি তাদের কিন্তু রেহাই দিলে না, ঘাড় ধ'রে রাস্তায় বের ক'রে দিলে।

সকাল গড়িয়ে দশটা তখন বাজে বাজে, নানা জায়গায় ভিক্ষের বদলে উপদেশ ও বিদ্রূপ ঝুলিতে ভ'রে, এক পুরনো লোহার দোকানের সামনে একতারা বাজিয়ে 'নাম' ধরতেই ঠং ক'রে একটা টাকা ছিটকে

তাদের কাছ বরাবর এসে প'ড়ে তাদের চমকে দিলে। বোষ্টমী সাগ্রহে টাকাটা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকাতেই লোহাওলা হেসে ব'লে উঠল, গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা কর, রোজ যেন এই রকম দাঁও মারতে পারি, রোজ একটি ক'রে টাকা ছাড়ব।

তারপর তার কী হাসি! বোষ্টম বোষ্টমী জয় হ'ক ব'লে বিদায় নিলে।

২

চালের কন্‌ট্রোলের মস্ত সারি। মেয়েদের সারিটা একটু ছোট দেখে বোষ্টমী দাঁড়িয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ বোষ্টমী ইসারায় বোষ্টমকে কাছে ডেকে ফিসফিস ক'রে বললে, এরা বলছে, ঠিক ঠিক ভাঙ্গানি না দিতে পারলে চাল মিলবে না। তুমি চট ক'রে একবার ওই বাজার থেকে কিছু একটা কিনে টাকাটা ভাঙ্গিয়ে আন না!

বোষ্টম হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিতে বোষ্টমী আবার ফিসফিস ক'রে ব'লে উঠল, যাবে আর আসবে বুঝলে, মাত্র আর দশজন আমার আগে আছে।

বোষ্টম টাকাটা মুঠোর মধ্যে সজোরে চেপে ধ'রে তার ক্লান্ত দুর্বল পা দু খানা চালিয়ে হন্তদন্ত হ'য়ে বাজারে ঢুকে পড়ল। বাঁকের মুখে সে আর তাল সামলাতে পারলে না, একেবারে শ্রীমতী নবনীতার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

শ্রীমতী নবনীতা স্তাবক পরিবৃত হ'য়ে তখন বাজার করছিল। বোষ্টম আর যায় কোথায়! স্তাবকদের মধ্যে পরম উৎসাহী একজন বোষ্টমকে ধ'রে বেদম প্রহার দিতে শুরু ক'রে দিলে। মুখে তার তখন খই ফুটছিল, ব্যাটা চালাকি পেয়েছ, মহিলাকে ধাক্কা, আবার বোষ্টম সেজেছ, ব্যাটা বদমাসের ধাড়ী! মেরে তোকে আজ আমি খুন করব!

পাঁচ সাতটা ঘুষি খাওয়ার পর বোষ্টম আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না,

হুমড়ি খেয়ে সামনে প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুঠো শিথিল হ'য়ে খুলে যেতে টাকাটা হাত থেকে ছিটকে প'ড়ে গড়াতে গড়াতে ঝাঁজরি দিয়ে ড্রেনের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

বোষ্টমীর সামনে তখন মাত্র তিন জন। সে সবিশেষ চঞ্চল হ'য়ে উৎসুক নয়নে বাজারের দিকে ঘন ঘন চাইতে লাগল। কিন্তু বোষ্টম কই!

চঞ্চলতার মধ্যে দিয়েই তার পালা সাঙ্গ হ'ল। সে উদ্বিগ্ন হ'য়ে বোষ্টমকে বাজারে, এধারে, ওধারে, চারিদিকে খুঁজতে লাগল। বহুক্ষণ ধ'রে সে তাকে খুঁজলে, অবশেষে অস্থির হ'য়ে ডেরার দিকে এগিয়ে চলল।

ডেরায় ঢুকে সে দেখে, বোষ্টম চোখ বুঁজে দরমায় ঠেসান দিয়ে একতারা বাজিয়ে ধীরে ধীরে 'নাম' ক'রে চলেছে। সর্বাঙ্গ তার কাদা মাখা, সারা মুখ তার কালশিরে প'ড়ে ফুলে উঠেছে, মুখের নানা জায়গায় কাটা, মুখখানা চোখের জল আর চোঁয়া রক্তে ভাসছে।

বোষ্টমী কিছু জিজ্ঞাসা করলে না, শুধু বুকভরা বেদনা নিয়ে সজল চোখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কখন সে বিহ্বল হ'য়ে সুরে সুর মিলিয়ে 'নাম' করতে লেগে গেল।

রাত একটা

১

প্রায় সাতাশ আটাশ বছর আগেকার কথা। তখন শীতকাল। তিন দিন ধ'রে এক নাগাড়ে বৃষ্টি চলেছে, এধারে হাওয়াও চালাচ্ছে খুব। তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে, আধভেজা হ'য়ে, এক রকম কাঁপতে কাঁপতে রাত্রি আটটা নাগাত বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই অনন্তর কানে এল, 'টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম'। অনন্ত চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার হ'তে লাগল, 'অনন্তলাল রায় টেলিগ্রাম, অনন্তলাল রায় টেলিগ্রাম'।

অনন্ত দুরু দুরু বুক নিয়ে নীচে নেমে গেল। অসীমও পিছনে পিছনে দৌড়ল। টেলিগ্রামখানা সই ক'রে নিতে না নিতেই অসীম সভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, কার টেলিগ্রাম, ছোড়দা?

অনন্ত অস্থিরতার সঙ্গে উত্তর করলে, বড়দার। বৌদির অবস্থা খুব খারাপ, তোর ছোটবৌদিকে নিয়ে টেলিগ্রাম পেয়েই রওনা হ'তে বলেছে। তোর ছোটবৌদিকে তো নিয়ে আসতেই যাবে দু দিন, কি করা যায় বল্ তো?

অনন্ত অসীমের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ব'লে যেতে লাগল, আমি বরং আজ রাত্রেই দশটা দশের ট্রেনে বেরিয়ে পড়ি, কাল বোধ হয় তিনটে নাগাত প্রতাপগড় পৌঁছে যাব। তুই আজ তো পুরী এক্সপ্রেস

ধরতে পারবি না, কাল তোর ছোটবৌদিকে আনতে পুরী যা, তারপর ওকে কলকাতায় এনে সোজা প্রতাপগড় চ'লে যাবি। কি বলিস ? এই বন্দোবস্তই হ'ল। অনন্ত তাড়াতাড়ি কোন রকমে সব সেরে নিয়ে বৃষ্টি মাথায় ক'রে একটি সুটকেস ও হোল্ড্-অল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

২

স্টেশনে ভিড় একেবারেই নেই। ইন্‌টার ক্লাস টিকিট কেটে একখানি ছোট কামরা দেখে সে উঠে পড়ল। কামরাখানি খালি। হোল্ড্-অল বিছিয়ে, সুটকেসটা বাঙ্কে রেখে অনন্ত হাতঘড়িতে দেখলে, সাড়ে নটা।

একটু বসতে না বসতেই সে মনে মনে ব'লে উঠল, এই যা, টাইমটেবল্ তো কেনা হ'ল না!

সে প্ল্যাটফর্ম্এ নেমে প'ড়ে কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে এধার ওধার দেখলে। কোন বুকস্টল দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে দেখে, একজন তরুণ আর একজন তরুণী ওই কামরায় ব'সে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত।

সে গাড়িতে উঠতেই তরুণ তার ডান হাতখানা পকেটে পুরে সোজা লাফিয়ে উঠল। তারপর অনন্তকে তার বিছানো হোল্ড্-অলের ওপর বসতে দেখে, নিজের জায়গায় ব'সে তরুণ এবার হাসিমুখে বললে, ও, তা হ'লে আপনিই এই গাড়িতে উঠেছেন ?

হ্যাঁ।

তরুণ তরুণীর দিকে একবার চাইলে, তারপর অনন্তর দিকে চেয়ে হেসেই বললে, কি মুশকিলেই ফেলেছিলেন, বেওয়ারিস জিনিসপত্র দেখে সরিয়ে ফেলবার বড় লোভ হচ্ছিল, কার না হয় বলুন ?

তরুণ প্রাণখোলা হাসি হাসলে। সলজ্জ হাসি তরুণীর সারামুখে ফুটে উঠল। অনন্তও হেসে ফেলে বললে, কিন্তু ভাঁড়ে মা ভবানী,

ওগুলোর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই।

তা হ'লে বলুন, জাতও যেত, পেটও ভ'রত না!

এই ব'লে সে হোহো ক'রে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে সে অনন্তকে জিজ্ঞাসা করলে, তারপর জিনিসপত্রগুলোকে পিতৃহীন ক'রে গিয়েছিলেন কোথায়?

টাইমটেবল্ কিনতে।

খালি হাতে তো ফিরলেন দেখছি, যাই হ'ক, চিন্তার কিছু নেই, আমাদের কাছে আছে। কোথায় যাবেন?

প্রতাপগড়। আপনারা?

কাশী যাব ব'লে তো বেরিয়েছি—

তারপর সে চোখের ইসারায় তরুণীকে দেখিয়ে হেসে ব'লে উঠল, এখন উনিই জানেন।

অনন্ত তরুণীর চাপা হাসি শুনতে পেলে। হঠাৎ তরুণ হাসি থামিয়ে পকেটে হাত পুরে প্ল্যাটফর্ম্এর দিকের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে সে হেসে অনন্তকে বললে, কাশী বাস করব ভাবছি, আপনি কি বলেন?

অনন্তও হেসে উত্তর করলে, বেশ তো!

তরুণ হঠাৎ আবার উঠে পড়ল। মুখে তার কাঠিন্য ফুটে উঠল। এবার সে প্ল্যাটফর্ম্এ নেমে প'ড়ে এধার ওধার দেখতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে ফিরে এসে তরুণীর দিকে চাইলে, তারপর ব'সে প'ড়ে অনন্তকে চিন্তিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি প্রতাপগড় যাবেন বলছিলেন, না?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

না, তা হ'লে তো—

তরুণ বেশ জোরে হেসেই ব'লে উঠল, তা হ'লে তো মানে আমাদের ফেলেই চ'লে যাবেন দেখছি!

সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, যখন যাবেনই, আপনাকে তো ধ'রে রাখতে পারব না, কিন্তু তার আগে আপনাকে একটু দয়া করতে হবে।

অনন্ত তরুণের মুখের দিকে চাইতে তরুণ তরুণীকে দেখিয়ে অনন্তকে হেসে বললে, আমার এই লাগেজটির ওপর আপনাকে একটু লক্ষ রাখতে হবে, আমি চট ক'রে একবার ঘুরে আসব।

অনন্ত হাতঘড়ি দেখে আশ্চর্যের সঙ্গে বললে, আর তো মাত্র দশ মিনিট সময় আছে!

ওতেই হবে, আমি যাব আর আসব।

তরুণ যেতে যেতে হেসে ব'লে উঠল, লাগেজটির ওপর তা হ'লে নজর রাখবেন কিন্তু, যেন ভুলে যাবেন না, আমি এলাম ব'লে!

তরুণ এক রকম দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

৩

দু এক মিনিট যেতে না যেতেই অনন্ত বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আরো দু মিনিটের মধ্যে প্ল্যাটফর্ম্‌এ নেমে প'ড়ে সে পায়চারি শুরু ক'রে দিলে। তখন মাত্র তিন মিনিট আছে, সে অত শীতেও ঘেমে উঠল, অস্ফুটস্বরে বললে, কি মুশকিল!

মাত্র তখন এক মিনিট আছে, অনন্তর বুকটা রীতিমত ধড়ফড় করতে লাগল। সে জানলার ধারে এসে অস্থির হ'য়ে তরুণীকে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গেলেন বলুন তো?

তরুণীর চোখে মুখে উদ্‌বেগের চিহ্ন। সে সভয়ে ব'লে উঠল, আমি, আমি তো জানি না, যদি ট্রেন ছেড়ে দেয়!

অনন্ত ক্ষেপে গিয়ে বললে, আমিও তো সেই কথাই ভাবছি, আচ্ছা লোক যা হ'ক!

ট্রেনের বিদায় নেবার ঘণ্টা বাজল। গার্ডও বাঁশি বাজালে, ট্রেন

চলতে শুরু করল। অনন্ত ভীষণ অস্থিরতার সঙ্গে তরুণীকে খুব চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, এক কাজ করুন, এলার্ম চেনটা টেনে দিন, দি—

অনন্তকে আর বলতে হ'ল না, পিছনের দরজা দিয়ে তরুণকে ভিজে সপসপে হ'য়ে ঢুকতে দেখে, সে তাড়াতাড়ি এক রকম লাফিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। রাগে তখন তার সর্বাঙ্গ জ্বলছিল, সে কোন দিকে না চেয়ে মুখখানা গোঁজ ক'রে নিজের সিটে গিয়ে বসল।

তরুণী তরুণকে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, তোমার এত দেরি হ'ল যে! ও মা! তুমি যে বড্ড ভিজে গেছ, এক্ষুণি কাপড় জামা ছেড়ে ফেলো, নইলে এই শীতে অসুখ করবে!

তরুণ একটু হেসে উত্তর করলে, ও কিছু নয়, এক্ষুণি শুখিয়ে যাবে। নাও, এইটে রাখ। পরে খুব সম্ভব দরকার হবে।

তরুণ তরুণীর হাতে কি একটা গুঁজে দিলে। তারপর সে ব'লে উঠল, দেরি আর হবে না! কিছুক্ষণ আগে যা তোমায় বলেছিলাম, অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। স্টেশনে সুধাংশুবাবুকে দেখতে পেলাম। আজকে ভোল একেবারে বদলে ফেলেছে! কোট প্যান্ট্ নেই, একেবারে স্বদেশী! পরণে খাঁটি খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে সাদা নাগরা, গায়ে কাশ্মিরী শাল, মুখে বর্মা চুরুট! সে গোঁফ আর নেই, একেবারে চাঁচা ছোলা!

এই ব'লে তরুণ হাসলে। তরুণী সাগ্রহে ব'লে উঠল, তোমাকে চিনতে পারলে?

চেনবার অবকাশ তাকে আমি দিই নি।

তরুণী একটু হাসলে, তারপর হাসি থামিয়ে অনন্তকে দেখিয়ে সে অনুযোগের সুরে তরুণকে বললে, উনি কিন্তু তোমার দেরি হচ্ছে দেখে, মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন!

তরুণ অনন্তর কাছে গিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে বললে, আপনাকে সত্যি

বড় কষ্ট দিয়ে ফেললাম !

তবে আর কি, আমার মাথাটা কিনে ফেললেন !

আমার ওপর বড্ড চ'টে গেছেন, না ?

যদি চ'টেই থাকি, অন্যায় করেছি কি !

না, এক্ষেত্রে অবশ্য চটা খুবই স্বাভাবিক, তবে—

আপনি যে কথাই বলুন না কেন, আপনার মতন আমি এমন দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোক জীবনে কখনো দেখি নি !

কিন্তু সত্যি এ অপবাদ আমার প্রাপ্য নয়।

অনন্ত মনে মনে ভাবলে, বলে কি !

তরুণ অনন্তর মনের কথা বুঝতে পেরে ব'লে উঠল, আমি বুঝতে পারছি, আপনি আমার কথায় আশ্চর্য হচ্ছেন, কিন্তু ওই যে রুক্মিণীকে সুধাংশুবাবুর কথা বলছিলাম। ওই সুধাংশুবাবু আমার একজন মস্তবড় হিতাকাঙ্ক্ষী, ওর সঙ্গে চারি চক্ষুর মিলন হয়েছে কি, উনি আতিথ্য গ্রহণ না করিয়ে ছাড়বেন না ! ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়াতে গিয়েই তো দেরি হ'য়ে গেল ! একটা খুব দরকারী জিনিস কিনে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম্‌এর গেটের দিকে আসছি, দেখি উনি একেবারে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ! কি করি, আর তো এগতে পারা যায় না ! থমকে দাঁড়ালাম। তারপর কানে এল, গাড়ি ছাড়ার শেষ ঘণ্টা, গার্ডের বাঁশি। পাশের প্ল্যাটফর্ম্‌এ যন্ত্রচালিতের মত ঢুকে পড়লাম। মরি কি বাঁচি, এইভাবে ছুটতে লাগলাম। অতি কষ্টে গাড়িটা ধরলাম। এতেও কি আপনি আমার ওপর সদয় হবেন না !

তরুণের কথা বলার ভঙ্গিতে অনন্ত হেসে ফেললে, তার রাগ জল হ'য়ে গেল।

তরুণ সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল, তা হ'লে কি দয়া পেলাম, বলুন ?

দয়া পাবার আপনি যোগ্য।

ব্যস্, ব্যস্. ওতেই আমার হবে, আমি আর কিছু চাই না।

তিন জনেই হেসে উঠল। অনন্ত হাসি থামিয়ে ফুর্তির সঙ্গে বললে, আপনার বন্ধু তো দেখছি খুবই জবরদস্ত! এর আগে কখনো আতিথ্য-গ্রহণ করেছিলেন না কি?

তরুণ হেসে বললে, জবরদস্তির ঠ্যালায় সত্যি কথা বলতে কি, আতিথ্যগ্রহণ করতে কোনদিন ভরসা করিনি, শেষকালে কি পৈতৃক প্রাণটা হারাব! আর উনি তো—

এই ব'লে তরুণ চোখের ইসারায় তরুণীকে দেখিয়ে অনন্তকে বলতে লাগল, আর উনি তো সুধাংশুবাবুর ওপর হাড়ে চটা, শেষকালে কি গৃহযুদ্ধ বাঁধাব!

তরুণ এই ব'লে হোহো ক'রে হেসে উঠল। হাসি প্রশমিত ক'রে সে তরুণীকে বললে, বড্ড খিদে পেয়েছে।

এই তো খেয়ে এলে!

কি রকম দৌড়টা হ'ল, দেখ! সত্যি, অগ্নয়ে স্বাহা বলবার মত কিছু দাও।

তরুণীকে কাঁচুমাচু হ'য়ে পড়তে দেখে অনন্ত উঠে প'ড়ে বাক্স থেকে তার খাবারের কৌটোটা পেড়ে, সেটি তরুণের দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখে, তরুণের হাস্যোজ্জ্বল মুখ গম্ভীর ও কঠিন, সে যেন গভীর চিন্তামগ্ন। অনন্ত তরুণের দিকে অবাক হ'য়ে অল্পক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর খাবারটা পাশে রেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, কি হ'ল আপনার, হঠাৎ গুম হ'য়ে গেলেন যে?

অ্যাঁ! ও, না, তেমন কিছু নয়, হিতাকাঙ্ক্ষীর কথা একটু ভাবছিলাম।

সুধাংশুবাবুর?

তরুণ এবার হেসে ব'লে উঠল, হ্যাঁ। বড্ড জানাশোনা কি না, আমরা যাচ্ছি কি ক'রে জানতে পেরেছেন, আমাদের খুঁজে বের করতে না

পেরে হয়তো এই ট্রেনেই চেপে চলেছেন !

এই রকম করেন নাকি ?

বড্ড হৃদ্যতা যে !

তা হ'লে উনি তো আপনাদের খুঁজে বের ক'রে ওঁর ওখানে নিয়ে যাবেনই দেখছি !

সেই কথাই তো ভাবছি !

তরুণী হঠাৎ ব'লে উঠল, আমি কিন্তু তোমায় আগে থাকতেই ব'লে দিচ্ছি, আমি ওঁর ওখানে কিছুতেই উঠব না, হ'লই বা জানাশোনা, তা ব'লে পরের ওখানে উঠতে হবে !

আমি কি উঠতে যাচ্ছি না কি ! কিছু ভেবো না, এখন বল দেখি, তোমার ক্যামেরাটা ঠিক আছে কি না ? প্রকৃতিদেবী এই অন্ধকারে কখন যে তাঁর কোন রূপ সামনে মেলে ধরবেন, কিছু তো বলা যায় না রুক্মিণী, হয়তো স্ন্যাপসট নেবার প্রয়োজন হ'তে পারে ।

অনন্ত তরুণকে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, আপনারা তা হ'লে শিল্পী !

প্রত্যেক মানুষই তো শিল্পী । যে যে-ক্ষেত্রে আছে, সে যদি সে-ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে কাজ করে, সেইই তো শিল্পী ।

তরুণের কথাগুলো অনন্তর খুব ভাল লাগল । সে ব'লে উঠল, একথা খুবই সত্যি । এ নেশা আপনার ছেলেবেলা থেকেই আছে নাকি ?

আগে শখ ছিল, কিন্তু নেশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ওঁর সংস্পর্শে আসার পর থেকে ।

এই ব'লে তরুণ হেসে তরুণীকে দেখিয়ে দিলে । তারপর সে বলতে লাগল, এখন ক্যামেরা ফিল্‌ম্ ছাড়া একদণ্ডও নড়তে পারি না । আর ওঁর কথা তো ছেড়েই দিন, ওগুলো যেন ওঁর প্রাণ ! রাত্রে শোবেন, তা-ও বালিশের পাশে ফিল্‌ম্‌ভর্তি ক্যামেরা রেখে !

তরুণী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ব'লে উঠল, গল্প পেলে তো আর কিছু

চাও না! এই তো খিদের ঠ্যালায় কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, এখন তো বেশ কথা বেরুচ্ছে!

এই দেখ, এত খিদে পেয়েছে, অথচ আমি খিদের কথা একেবারে ভুলে গেছি!

অনন্ত হেসে ফেলে ব'লে উঠল, আপনার তা হ'লে দৃষ্টি-খিদে।

না না না, সত্যি ভয়ানক খিদে পেয়েছে, পেট যে আমার খাঁমচে খাঁমচে ধরছে!

খাবারের কৌটোটা তরুণের দিকে এগিয়ে দিয়ে অনন্ত ব'লে উঠল, তা হ'লে কোন আপত্তি তুলবেন না, সদ্‌ব্যবহার করুন।

আপত্তি তুলব আমি!

এই ব'লে তরুণ বেশ হেসে উঠল। তারপর সে বলতে লাগল, জানেন, আমার কোষ্ঠীতে এসব লেখে নি!

তরুণ হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে স্বরে অনুনয় মাখিয়ে ব'লে উঠল, একটা কথা আপনাকে বলব?

কি কথা!

আপনার ওপর আমার বড় হিংসে হচ্ছে।

হিংসে!

হ্যাঁ।

কেন!

পূর্ণমানব শ্রীকৃষ্ণ ব'নে গেলেন!

তার মানে!

রুক্মিণীর কাছে খাবার চাইলাম, রুক্মিণী মনে মনে হা শ্রীকৃষ্ণ, হা শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ডাকতে লাগল, আপনি শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে রুক্মিণীকে উদ্ধার করলেন।

তিন জনেই প্রায় একসঙ্গে হেসে উঠল। তরুণ তরুণীর দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, দেখ, সুধাংশুবাবুর তো ছোঁয়াচ লাগাতে চাও না, এঁর

খাবারে আপত্তি নেই তো ?

তরুণী চাপা হাসির সঙ্গে উত্তর করলে, না।

তরুণ অনন্তকে বললে, আসুন, এবার তা হ'লে লেগে পড়া যাক।

শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে উদ্ধার করেছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে সেই খাবারে ভাগ বসিয়েছিলেন, এরকম হদিস তো কোথাও নেই !

ও, তাও তো বটে। আচ্ছা, কুচপরোয়া নেই, আমিই গণ্ডুষ ক'রে দিচ্ছি।

এই ব'লে সে শুরু করলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই খাওয়া শেষ ক'রে সে তরুণীর দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, জল।

জল, জল তো নেই।

তরুণ গম্ভীর হ'য়ে ব'লে উঠল, নেই বলতে নেই দেবী, গদগদ কণ্ঠে একবার হা শ্রীকৃষ্ণ, হা শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ডাকতে থাকুন !

অনন্ত হাসতে হাসতে জলাধারটি এগিয়ে দিয়ে বললে, এই নিন।

বহুৎ, বহুৎ আচ্ছা।

তরুণ জল খেয়ে জলাধারটি অনন্তর হাতে দিতে দিতে ব'লে উঠল, সবই তো হ'ল, শোওয়াটা আর বাকী থাকে কেন ! শুয়ে পড়া যাক, কি বলেন ?

এই ব'লে জুতো প'রেই সে শুয়ে পড়ল।

৪

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তরুণ তড়াক ক'রে উঠে প'ড়ে অনন্তকে বললে, সাধে কি প্রাচীন আমাদের অর্বাচিন বলেন ! আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ হ'ল, ঘনিষ্টতাও হ'ল, অথচ পরিচয় হ'ল না !

দোষ কিন্তু উভয়তঃ।

পূর্ণমানব কি কখনো দোষ করতে পারেন ! আচ্ছা, প্রতাপগড়ে

আপনার কে থাকেন ?

দাদা।

কি নাম বলুন তো ?

আপনি প্রতাপগড়ে গিয়েছেন না কি ?

যাই নি, তবে যেতেও তো পারি !

অনন্ত হেসে ফেলে বললে, দাদার নাম অনাদি রায়।

আপনার নাম তো তা হ'লে আমি জানি।

অনন্তকে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে তরুণ ব'লে উঠল, আপনার নাম তো অনন্ত রায়।

হ্যাঁ, আপনি কি ক'রে জানলেন !

অনাদির পর যে অনন্ত, এ তো শাশ্বত।

অনন্ত হেসে ব'লে উঠল, আমাকে তো রিক্ত করছেন, কিন্তু নিজের কথা তো কিছুই বলছেন না ?

যেচে বলতে বলছেন, বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই, এ দীনের নাম ভবানী রুদ্র। দাদা কি করেন, অনন্তবাবু ?

ওখানকার হাইস্কুলের হেড মাস্টার !

তরুণ চুপ ক'রে গিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। অনন্ত তরুণের এ ভাবান্তর লক্ষ ক'রে ব'লে উঠল, কি, চুপ ক'রে গেলেন যে ?

ভাবছি স্কুলেতেই তো আমাদের গোড়াপত্তন হবার কথা, মনের ছাঁচ তৈরি হবার কথা। কিন্তু এসব তো ওখানে কিছুই হয় না, ভাসা ভাসা মন নিয়ে ছেলেরা বেরয়, মনের কোথাও কোন রেখাপাত নেই, খাড়া মেরুদণ্ড কাকে বলে তারা জানে না।

খাড়া মেরুদণ্ড !

হ্যাঁ, যার জোরে আমরা অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করি।

কিন্তু দেশের অনেক সুসন্তানরা তো ওই সব স্কুলের ছাঁচে গ'ড়ে উঠে সুসন্তান হয়েছেন ?

তরুণের চোখ দুটি হঠাৎ জ্ব'লে উঠল, সে বলতে লাগল, সে কি ক'রে হ'তে পারে ! ছাঁচ যিনি তৈরি করবেন, সেই শিক্ষকের ওখানে স্বাধীনতা কোথায় ! আপনি যদি শিক্ষক হন, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার অনুপ্রেরণা জোগান, স্কুলের কাঠামো আপনাকে চোখ রাঙিয়ে ব'লে উঠবে, ওসব এখানে চলবে না, ছেলেদের মাথা খাওয়া চলবে না। আপনি যদি না শোনেন, নিজের পথে চলেন, আপনার অন্ন উঠবে। শিক্ষকই যদি কাঠামোর চাপে প'ড়ে আধমরা হ'য়ে যান, ছাঁচ তৈরি করবে কে, আমায় বলতে পারেন ?

কিন্তু—

তরুণের চোখ দুটি আরো জ্ব'লে উঠল, সে অনন্তকে বাধা দিয়ে বলতে লাগল, নিরস্ মাটিতে ফসল ফলাবেন কি ক'রে ! আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলাবেন কি ক'রে !

তার চোখ দুটি এবার ভয়ানক জ্বলজ্বল ক'রে উঠল, সে অস্থিরতার সঙ্গে বলতে লাগল, ছেলেরা কি রকম হবে জানেন ? ছেলেরা হবে, দেহমনে স্বাস্থ্যবান, হাজার আঘাতেও তারা নুয়ে পড়বে না, তাদের চোখ খোলা থাকবে, কান খাড়া থাকবে, কোন রকম অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার সহ্য করবার শিক্ষা তারা পাবে না। তাদের শেখাতে হবে, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার দেখলেই আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে, কাউকে ক্ষমা করা চলবে না, দরকার হ'লে আগুন জ্বালাতে হবে, সেই আগুনে নিজেদের যদি পুড়ে মরতেও হয়, হবে, কিন্তু—

তরুণী হঠাৎ ভীষণ কাশতে লাগল। তরুণ বাধা পেয়ে সেই দিকে চাইতেই তাদের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। তরুণ জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, গলায়

কিছু আটকেছে বুঝি ?

সুপুরি।

জল খাবে।

কাশি ক'মে আসছে।

কাশি থামতে তরুণ অনন্তকে জিজ্ঞাসা করলে, চেঞ্জে যাচ্ছেন বুঝি ?

না, বৌদির বড্ড অসুখ, দাদার কাছে থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে যাচ্ছি।

কি হয়েছে ?

সে সব কিছু লেখেন নি।

আর কথা বলা হ'ল না। গাড়ি ঘড়ঘড় শব্দে বর্ধমান স্টেশনে প্রবেশ করল। অনন্ত জলাধারটি নিয়ে উঠতেই, তরুণ ব'লে উঠল, ও কি করছেন, আপনি কেন যাচ্ছেন! আমি যাচ্ছি, জল তো আমিই শেষ করেছি।

তা হ'ক।

অনন্ত একটু হেসে নেমে গেল। তরুণ তাড়াতাড়ি অনন্তর সিট থেকে তার র‍্যাপারখানা তুলে নিয়ে, মাথা, কান চাপা দিয়ে চোখ দুটি বের ক'রে রাখতে রাখতে তরুণীর দিকে চেয়ে হেসে বললে, বড্ড শীত করছে।

তরুণী একটু হাসলে। তারপর তরুণ গিয়ে দরজা ধ'রে দাঁড়াল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে তরুণীর কাছে এগিয়ে এল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা ব'লে আবার সে ফিরে গিয়ে দরজা ধ'রে দাঁড়াল।

অনন্ত জল নিয়ে কামরার কাছে ফিরে এসে তরুণকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, হেসে ফেলে বললে, কি ব্যাপার ?

বড্ড শীত করছে।

অনন্ত গাড়িতে উঠে সিটে গিয়ে বসতেই ট্রেন ছেড়ে দিলে। তরুণ দরজাটা বন্ধ ক'রে ফিরে এসে অনন্তকে র‍্যাপারখানা ফেরত দিতে দিতে বললে, 'না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়', কি বলেন ?

অনন্ত হেসে তরুণের কথার খোঁজে উত্তর করলে, প্রয়োজন হইলে না বলিয়া লইলে বুদ্ধি প্রকাশ পায়।

সকলে হেসে উঠল। তরুণ ব'লে উঠল, এইবার শুয়ে পড়ুন, আপনাকে হয়তো গিয়ে রাত জাগতে হবে।

হ্যাঁ, এই নি।

সকলে শুয়ে পড়ল।

অনন্ত কিন্তু বালিশে মাথা ঠেকাতেই যত রাজ্যের ভাবনা তার মাথার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাতে লাগল। ঘুম তার কোথায় পালিয়ে গেল। তরুণের দৌলতে এতক্ষণ সে বেশ ভুলে ছিল, ভাবনা তার মধ্যে দানা বাঁধতে পারে নি। অনন্ত বেশ কিছুক্ষণ উসখুস, এপাশ ওপাশ ক'রে কাটালে, তারপর তার পক্ষে আর শুয়ে থাকা অসহ্য বোধ হ'তে লাগল। সে উঠে বসল। তরুণ তরুণীর দিকে তার নজর পড়ল, তারা দেখলে নিশ্চল হ'য়ে শুয়ে আছে, বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সে মনটা বিক্ষিপ্ত করবার জন্তে জানলাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। সেদিন অমাবস্যা, বাইরে ঘোর অন্ধকার, কোথাও আবার জমাট বাঁধা অন্ধকার। গাছপালাগুলো ছোট, বড় মূর্তি ধারণ ক'রে কী প্রতিযোগীতার সঙ্গেই না ছুটে চলেছে! বাইরের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তার চোখে মুখে লাগতে শরীরটা তার স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠল। মনও অনেকটা হালকা হ'ল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, এত শীতে জানলা খুলে ব'সে থাকা তার উচিত নয়। তরুণ-তরুণীর অসুবিধে হ'তে পারে। সে জানলা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'ল।

৫

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল অনন্ত অনুমান করতে পারলে না, হঠাৎ কার করস্পর্শে তার ঘুমটা চড়াক ক'রে ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলতেই সে দেখে

তরুণী তার পায়ের তলায় ব'সে তার পায়ে হাত বুলচ্ছে, আর তার বড় বড় চোখ দুটি মেলে সকাতরে তার দিকে চেয়ে আছে। সে চকিত ও বিস্মিত হ'য়ে পড়ল। সে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওপাশে চোখ পড়তেই দেখে, চার জন রাইফেলধারী পাঠান গোছের পুলিশ দুধারের দরজা চেপে দাঁড়িয়ে আছে। তরুণের সিটের দিকে চেয়ে দেখে, তরুণ নেই, একজন সাহেব পুলিশ অফিসার আর একজন শাল গায়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরা আধাবয়সী ভদ্রলোক সেখানে ব'সে আছেন। ভয়ে তার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হ'ল। সে তরুণীর দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চাইতেই, তরুণী উৎকণ্ঠা ও আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠল, ওগো, তুমি ভয় পেয়ো না, এখন শরীরটা কি রকম ঠেকছে? একটু ভাল বোধ করছ? বুকের ধড়ফড়ানি?

অনন্ত কি বলতে গেল, কিন্তু ভয়ে তার গলার ভেতরটা শুখিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল, কথা তার বেরল না। তরুণী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, এখনো আছে! না না, লক্ষ্মীটি, তোমায় কথায় জবাব দিতে হবে না, তুমি একটু ঘুমোও, ও এক্ষুণি বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর সে উঠে পাশে দাঁড়িয়ে, অনুযোগ মাখা স্বরে, মিনতি মাখা চোখে রাগটা অনন্তর গলা পর্যন্ত চাপা দিতে দিতে ব'লে উঠল, কি যে ছেলেমানুষি কর তার ঠিক নেই! 'কোট, পুলওভার গায়ে দেবে না, আর যতবার রাগটা চাপা দিয়ে দিচ্ছি, ততবার খুলে ফেলছ! একে তো হার্টে কিছু নেই, তার ওপর এই দারুণ ঠাণ্ডা লেগে একটা বিপত্তি বাঁধুক আর কি!

সে ফিরে এসে পায়ের তলায় আবার ব'সে অনন্তর পা দুটো টিপে দিতে দিতে বললে, মাথাটা ব্যথা করছে? মাথাটা একটু টিপে দেবো? অনন্ত খুব আস্তে আস্তে অতি কষ্টে নিজের স্ত্রীর নাম ধ'রে বসা গলায় ডেকে বললে, না অমলা, তোমায় আর কিছু করতে হবে না, আমি

অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।

তারপর সে নিজের বাঁ হাতখানা র‍্যাগের মধ্যে থেকে বের ক'রে দিয়ে বললে, দেখ তো কটা বেজেছে?

একটা।

ও।

অনন্ত হাতখানা র‍্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শোবার উপক্রম করতে, শাল গায়ে ভদ্রলোক উঠে এসে অনন্তকে কড়া গলায় বললেন, আমি আপনাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই?

অনন্ত যেন আকাশ থেকে প'ড়ে উত্তর করলে, আমায়! কেন?

দরকার হ'য়ে পড়েছে।

আপনি, আপনি কে আমি জানতে পারি কি?

আপনি আর উনি ছাড়া এই গাড়ির মধ্যে আর যাঁরা রয়েছেন, আমি তাঁদেরই একজন।

ও। আপনি কী জানতে চান?

কোথায় যাচ্ছেন?

কেন, প্রতাপগড়ে আমার দাদার ওখানে।

কোথা থেকে উঠেছেন?

হাওড়া থেকে।

আপনার নাম?

অনন্ত রায়।

কি করেন?

বীমার দালালি করি।

দেখি টিকিটগুলো?

অনন্তর মুখ হঠাৎ শুখিয়ে আমসি হ'য়ে গেল। সে তরুণীর দিকে ক্যাল-ক্যাল ক'রে চাইতেই তরুণী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, খুব কষ্ট হ'চ্ছে

তো! এত কথাবার্তা বললে আর কষ্ট হবে না!

সে ভদ্রলোকের দিকে কঠিন হ'য়ে চেয়ে অনন্তকে আবার বললে, দোহাই তোমার, তুমি ওঠবার চেষ্টা ক'রো না, কোথায় টিকিট আছে বল, আমি দিয়ে দিচ্ছি?

টিকিট! টিকিট কোটের ভেতরের পকেটে ব্যাগে আছে।

তরুণী উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক একটু স'রে গেলেন। সে গিয়ে হ্যাঙ্গার থেকে কোটটা নামালে। অনন্ত ভয়ে-ময়ে চোখ বুঁজল। অল্পক্ষণের মধ্যে তরুণী ফিরে এসে অনন্তর হাতে দু খানা টিকিট গুঁজে দিয়ে ব'লে উঠল, টিকিট দুটো নাও, দিয়ে দাও।

অ্যাঁ! ও, নি।

অনন্ত সাগ্রহে টিকিট দু খানা নিয়ে হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোককে দিলে। ভদ্রলোক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে টিকিট পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। নিজে দেখে, টিকিট দু খানা তিনি পুলিশ অফিসারের হাতে দিলেন। পুলিশ অফিসার উলটে পালটে দেখতে লাগলেন। দেখা শেষ হ'লে তাঁদের মধ্যে চোখে কি কথা হ'ল। ভদ্রলোক টিকিট দু খানা অনন্তর হাতে ফেরত দিতে দিতে চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি জন্যে যাচ্ছেন?

টিকিটপর্ব সুশৃঙ্খলে শেষ হওয়ায়, অনন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। সে বুকে যথেষ্ট বল পেলে। এবার সে চ'টে যাবার ভান ক'রে আধ-ওঠা হ'য়ে কাঁপার ভাব দেখিয়ে ব'লে উঠল, দরকার আছে ব'লেই যাচ্ছি, নইলে এই দুর্যোগে এই অসুস্থ শরীরকে টেনে হিঁচড়ে কেউ নিয়ে যেত না!

বাজে কথা বলবেন না, ঠিক ঠিক উত্তর দিন।

অনন্তও না দ'মে ব'লে উঠল, আচ্ছা, আপনারা কি চান বলুন তো! এত রাত্রে, এই শীতকালে, একজন রোগীকে এতক্ষণ ভুগিয়ে আপনাদের

আশা মিটল না! আপনারা কি আমাকে মারতে চান!

এই সব কথা ব'লে সে দস্তুর মত হাঁফাতে লাগল। সে বলতে গিয়েছিল ভান ক'রে, কিন্তু ব'লে ফেললে প্রাণ দিয়ে।

ভদ্রলোকটি একটু যেন কিন্তু বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু সে-ভাব মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়ে নিয়ে একটু নরম ক'রে তিনি বললেন, কর্ত্তব্যের খাতিরে আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে, এর জন্যে আমরা দুঃখিত, কিন্তু আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিন, বলুন, আপনারা কি জন্যে যাচ্ছেন?

অনন্ত ধপাস ক'রে শুয়ে প'ড়ে অতি ক্ষীণস্বরে হাঁফাতে হাঁফাতে ব'লে উঠল, দুঃখিত! বলে আমি মারা যাচ্ছি! আমরা কি জন্যে যাচ্ছি এই কথা জানালেই কি আপনি আমায় রেহাই দেবেন! আমরা—

কি মনে প'ড়ে যাওয়াতে সে থেমে প'ড়ে তরুণীর দিকে চেয়ে অতি কষ্টের সঙ্গে ব'লে উঠল, অমলা, এক কাজ কর তো, আমার কোটটা নামিয়ে দাও তো!

তরুণীর কাছ থেকে কোটটা নিয়ে, এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে তার দাদার টেলিগ্রামখানা বের ক'রে অনন্ত ভদ্রলোকটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, এই নিন, এতে সন্তুষ্ট হ'তে পারেন কি না, দেখুন!

টেলিগ্রামখানা দিয়ে সে চোখ বুঁজে প'ড়ে রইল। ভদ্রলোক গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে সেখানা পড়তে লাগলেন। টেলিগ্রাম পড়তে পড়তে তিনি মাঝে মাঝে অনন্ত ও তরুণীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ টেলিগ্রামখানা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে সাহেব অফিসারের হাতে সেখানি দিয়ে তিনি অনন্তকে বললেন, দেখুন, আমার আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাস্য আছে?

অনন্ত চোখ খুলে কাতরতার সঙ্গে ভদ্রলোকটির দিকে শুধু চেয়ে রইল। ভদ্রলোক হঠাৎ কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলেন, এ কামরায় আর কেউ ছিল?

না।

আমি যদি বলি ছিল !

এক্ষেত্রে আমি আর কি বলতে পারি !

পারেন, পারেন, বেশ ক'রে মনে ক'রে দেখুন। হাওড়ায় বা মাঝ রাস্তায় কোন যুবককে আপনি এ গাড়িতে উঠতে দেখেছিলেন ?

না, দেখিনি।

ভদ্রলোকটি হঠাৎ স্বর আরো কঠিন ক'রে তরুণীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলেন, আপনি ?

অনন্ত করুণ চাহনির সঙ্গে ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, ওঁকে, ওঁকে কেন আবার বিব্রত করছেন !

ভদ্রলোক গর্জন ক'রে ব'লে উঠলেন, চুপ করুন।

তরুণী কেঁদে ফেলে ব'লে উঠল, এঁকে, এঁকে এঁরা না মেরে ছাড়বেন না !

ভদ্রলোক কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন, কান্না অগ্রাহ্য ক'রে গলায় আরো জোর দিয়ে ব'লে উঠলেন, কাউকে দেখেছিলেন ?

তরুণী কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে অতি করুণ স্বরে বলতে লাগল, না, না, না।

হঠাৎ সাহেব পুলিশ অফিসার ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে ইংরেজীতে বললেন, না না, সুধাংশু, ওঁরা অতি সাধারণ লোক, মিছামিছি সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই, অনর্থক শত্রু বাড়িয়েও কাজ নেই। দেখছ না, শিকার পালিয়েছে ! নাও এই টেলিগ্রামখানা ফিরিয়ে দিয়ে চ'লে চল।

ভদ্রলোক টেলিগ্রামখানা অনন্তর হাতে দিতে দিতে একটু হেসে বললেন, এবার বিশ্রাম নিন, ধন্যবাদ !

গাড়ি ততক্ষণে একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ সদলবলে নেমে গেল।

অনেকদিন এক নাগাড়ে জ্বরে ভোগার পর খুব ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লে

মানুষের যে অবস্থা আসে, অনন্তর সেই অবস্থা এল। সে নির্জীব হ'য়ে প'ড়ে রইল। তরুণী তখুনি উঠে প'ড়ে দরজাটা ভাল ক'রে বন্ধ হয়েছে কিনা দেখে নিয়ে ফিরে আসতেই, দরজা খোলার আওয়াজ হ'ল। সে ছুটে গিয়ে অনন্তর পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে পায়ে হাত বুলতে আরম্ভ ক'রে দিলে। অনন্ত সত্যি এবার ক্ষীণস্বরে উৎকণ্ঠার সঙ্গে ব'লে উঠল, আবার কে আসছে!

তরুণী কিছু বলবার আগেই একজন টিকিট চেকার গাড়িতে উঠে, দরজাটা বন্ধ ক'রে ব'লে উঠল, টিকিট?

অনন্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে তরুণীকে ব'লে উঠল, টিকিট দু খানা যে দিতে হবে।

তরুণী অনন্তর দিকে চেয়ে এতক্ষণ পায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল। অনন্তর কথায় সে টিকিট দু খানি নিয়ে চেকারকে দিতে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই একটু হেসে অনন্তকে টিকিট ফেরত দিতে দিতে ব'লে উঠল, অনন্তবাবু, টিকিট দু খানা আপনি রাখুন, দেবার আর দরকার হবে না।

অনন্ত উঠে প'ড়ে ব'লে উঠল, অ্যাঁ! তার মানে!

তরুণী চেকারকে ব'লে উঠল, জানলে বিনায়কদা, আজ একমাত্র অনন্তবাবুর কল্যাণেই কিন্তু সুধাংশুবাবুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া গেছে!

সে আমি বুঝতে পেরেছি, অজন্তা!

এই ব'লে চেকার অনন্তর সামনের সিটে ব'সে মাথা থেকে টুপিটা নামাতেই অনন্ত পরম বিস্ময়ে ব'লে উঠল, ভবানীবাবু, আপনি!

তরুণ একটু হাসলে। তারপর সে তরুণীর দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, অজন্তা, তুমি অনন্তবাবুর পা ছেড়ো না, যতক্ষণ না আমরা নেমে যাই, ঠিক ওইভাবেই সেবা ক'রে যাও। আজকে ধরা প'ড়ে গেলে সব পণ্ড হ'য়ে যেত, এক বছরের ছকা পরিকল্পনা আমাদের একেবারে ধূলিসাৎ হ'য়ে যেত। অনন্তবাবু শুধু তোমার আমার নন, আমাদের যে যেখানে

আছে; সকলেরই নমস্ত।

ইঞ্জিন সেই মুহূর্তে শিটি দিয়ে উঠল, সেও যেন সানন্দে বিনায়কের মত সম্পূর্ণ সমর্থন করলে। ট্রেন তখন ভীম বিক্রমে ছুটে চলেছিল, বক্সা চুকছিল।

লেখকের

পরবর্তী তিনখানি বই

ব্যবধান

প্রাণবন্ত উপন্যাস

●

শতদল

বিভিন্ন রসপুষ্ট গল্পের বই

●

স্রোত

সুবৃহৎ রসঘন উপন্যাস